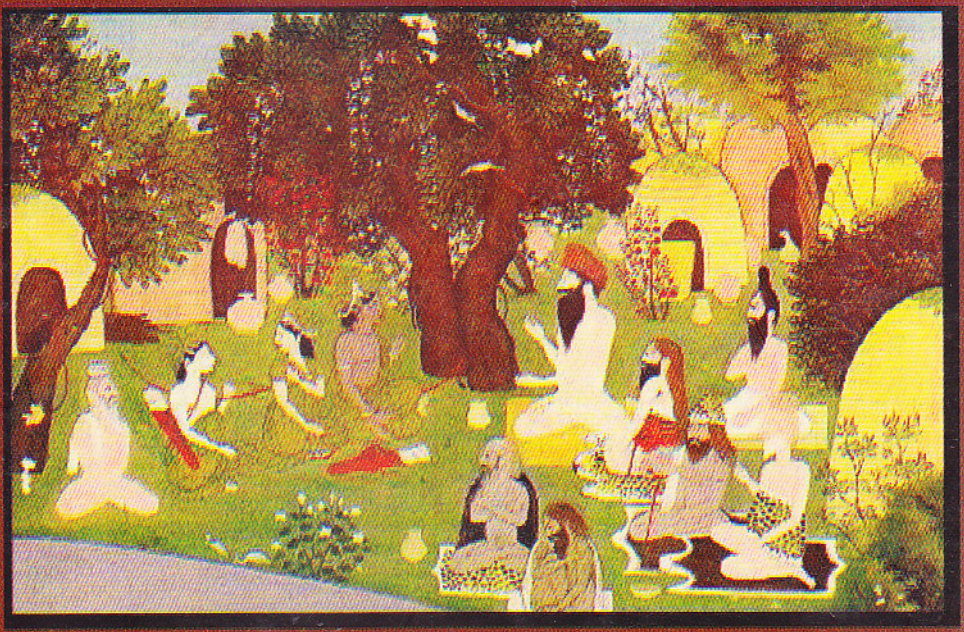

বাল্মীকি রামায়ণে রাম
আদিবাসী রামায়ণে রাম

বিপ্লব মাজী

Valmiki Ramayane Ram
Adibasi Ramayane Ram
(Rama in Valmiki Ramayana and in Tribal Ramayana)
by Biplab Majee

গ্রন্থস্বত্ব : দেবতনু মাজী

প্রথম প্রকাশ : কলকাতা বইমেলা, ২০১২

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা : দেবতনু মাজী

বর্ণসংস্থাপন : প্রিন্টম্যাক্স, ইছাপুর

প্রকাশক : দেবজ্যোতি কর
কোডেক্স, ৮এ টেমার লেন, কলকাতা-৯

মূল্য : ১২০ টাকা

মেদিনীপুর শহর থেকে প্রকাশিত
দৈনিক উপত্যকা সম্পাদক
তাপস মাইতি ও তাঁর সহধর্মিণী
কবিতা মাইতি-কে

সূচিপত্র

বাল্মিকী রামায়ণে রাম আদিবাসী রামায়ণে রাম ৯

কম্বন রচিত তামিল রামায়ণ রামকথাই্ ৪১

রামায়ণের সমাজতাত্ত্বিক ডিসর্কোস ৫৬

পরিশিষ্ট :

১. শ্রীরামের জন্মবৃত্তান্ত — নন্দিতা ভট্টাচার্য ৬০

২. রামায়ণ : মডার্ন, পোস্টমডার্ন ও মার্কসবাদী পাঠকৃতি — সূরয যোশী ৬৭

৩. রামায়ণের রাম — রমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ৭৫

ভূমিকা

রামায়ণের আবেদন শুধু ভারতের ক্ষেত্রে না, পৃথিবীর সবদেশের মানুষের চিরন্তন আশা-আকাঙ্ক্ষার ক্ষেত্রে তার প্রভাব আছে, কারণ মানবিক মূল্যবোধ। মানবিক মূল্যবোধের জন্য মানুষের যে চিরায়ত স্বপ্ন বা তৃষ্ণা তা রামায়ণ পূরণ করে। রামায়ণের ঐতিহ্য তাই ভারতবর্ষের সীমানা ছাড়িয়ে ভারতীয় উপমহাদেশে বিস্তৃত। ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতি জীবনে রামায়ণের প্রভাব সর্বত্রই। রামায়ণ শুধু ভারতীয় সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেনি, বিশ্ব সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। সংখ্যার পরিসংখ্যানে রামায়ণের প্রভাব পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি সংখ্যক মানুষের মনে। হোমরের ইলিয়দ ও ওদিসির প্রভাব পশ্চিমি সাহিত্যে থাকলেও, রামায়ণের মতো তা পশ্চিমি সমাজজীবনে প্রবেশ করেনি, বা সমাজ জীবনকে প্রভাবিত করতে পারেনি।

রামায়ণের প্রভাব দক্ষিণপূর্ব এশিয়া ছাড়াও তিব্বত, মালয়, শ্রীলঙ্কা, নেপাল, ফিলিপাইনসের শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতিতে যেমন আছে — আরবিক, উর্দু, পার্শিয়ান শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতিতে প্রভাব বিস্তার করেছে। এমনকি ব্রাজিলীয়, বুলগেরিয়ান, বার্মিজ, কাম্বোডিয়ান (খেমের), চিনে, চেকোশ্লোভাকিয়ান, মিশরীয়, ফরাসি, জার্মান, হিব্রু, হাঙ্গারিয়ান, ইন্দোনেশিয়ান, ইতালিয়ান, জাপানি, লাওশিয়ান, লাতিন, নরওয়েইয়ান, পোলিশ, রুশ, স্প্যানিশ, সুইডিশ, তার্কিশ, থাই, ইউক্রেনিয়ান, উজবেক ইত্যাদি ভাষার সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে রামায়ণ প্রভাব ফেলেছে। এ এক অবিশ্বাস্য তালিকা। রামায়ণের মানবিক আবেদনের জন্য এরকম ঘটনা ঘটতে পেরেছে। রামকথার মেটাফর মুক্ত আজও পৃথিবী হতে পারেনি। রামকথার বিনির্মাণ প্রতিদিন ঘটে চলেছে। রামায়ণ আজও আধুনিক পৃথিবীকে নানাভাবে প্রেরণা দেয় ও দীপ্ত করে।

রামায়ণের চরিত্রগুলির আর্কেটাইপ আধুনিক সাহিত্যে। রামায়ণের চরিত্রগুলির কাহিনী আধুনিক সমাজ ও রাষ্ট্র বিজ্ঞানের নানা সমস্যায়, বাদ-প্রতিবাদে প্রবাহমান, ব্যবহৃত হয়। প্রতিবাদ, প্রতিরোধের ভাষাও মানুষ রামায়ণ থেকে খুঁজে নিয়েছে। ভারতীয় সমাজ, ভারতীয় মানুষের মনস্তত্ত্ব ও সমাজতত্ত্ব বুঝতে হলেও রামায়ণ পাঠ অপরিহার্য। ভারতীয় অর্থনীতির মূল সুরও রামায়ণের সুরে বাঁধা। ভারতীয় পুরুষরা রামের মতো শ্রেষ্ঠ পুরুষ হতে চান, আর ভারতীয় নারীরা সীতার মতো সতী (এ নিয়ে যে বিতর্কই থাক)। বিভীষণ আজও ভারতীয় সমাজে নিন্দিত পরিভাষা—যার অর্থ বিশ্বাসঘাতক, যে ঘরের শত্রু, যে বাইরের শত্রুকে ঘরে ডেকে আনে।

রামায়ণে যেমন ভক্তির প্রাবল্য আছে, ন্যায় নীতি আদর্শের কথাও আছে। সমাজ সমালোচনা আছে। রামায়ণ নিছক একটি মহাকাব্য না। এই মহাকাব্য অসংখ্য ও নানা বিচিত্র ধরনের শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতির ফোয়ারার উৎসমুখ। যার শেকড় ছড়িয়ে আছে প্রতিটি

ভারতীয়ের মননে। রামায়ণ নিয়ে যে কোন গবেষণা মহাসাগরের জল নিয়ে মহাসাগরে গবেষণা। মনে হয় যতদিন মানবসমাজ এই বিশ্বে টিকে থাকবে, রামায়ণের বিনির্মাণ অব্যাহত থাকবে। এখানে রামায়ণের সিন্ধু থেকে বিন্দু নিয়ে পাঠকদের দেওয়া হল। এও এক ধরনের রামায়ণ পাঠ, রামায়ণের পাঠকৃতি, বা রামায়ণের বিনির্মাণ।

কোডেক্স-এর কর্ণধার গৌতমবাবু (দেবজ্যোতি কর) দীর্ঘদিন আমাকে এই বইটির পাণ্ডুলিপি তাঁর হাতে তুলে দেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছিলেন। তাঁর অনুরোধ শেষ পর্যন্ত রক্ষা করতে পেরে খুশি। পাঠকদের বইটি ভালো লাগলে আরো খুশি হব।

১৫ অক্টোবর, ২০১১ বিপ্লব মাজী

বাল্মিকী রামায়ণে রাম, আদিবাসী রামায়ণে রাম

রামায়ণ ভালবাসার গল্প বা উপন্যাস। ত্রিভুজ প্রেমের গল্প রাম-সীতা ও রাবণ। বাল্মিকী রামায়ণে রাবণকে ভিলেন চরিত্রে দেখানো হয়েছে, আদিবাসী রামায়ণগুলিতে কিন্তু রাবণের অন্য চরিত্র আছে। ভালবাসার মত মানবিক আবেগের গভীরতা আমরা বুঝতে পারি রামায়ণ পড়ে। রামায়ণ উপন্যাস বা আখ্যানে আছে স্বামীর প্রতি স্ত্রীর ভালবাসা, স্ত্রীর প্রতি স্বামীর ভালবাসা, ভাইয়ের প্রতি ভাইয়ের ভালবাসা, বাবা ও ছেলের মধ্যে ভালবাসা এবং বন্ধুদের মধ্যে ভালবাসা। রামায়ণ বা রামকথা শুধু ধর্মীয় অ্যাখ্যান, একান্তভাবেই গল্প; ঐতিহাসিক দলিল; নৃতাত্ত্বিক গবেষণার বিষয়। ধর্মভীরু মানুষেরা শত শত বছর রামায়ণ পাঠ করে আসছেন, প্রদীপ জ্বালিয়ে তুলসীমঞ্চের ধারে চৌকির ওপর রামায়ণ খুলে খসখসে গলায় পাঠ করে যান, আর পাড়ার শিশুরা, বৃদ্ধ-বণিতারা, এমনকি মাঠ থেকে ফেরা কৃষক সন্ধেবেলা সেই পাঠ শুনতে বসে যান। শোনেন গভীর মন দিয়ে। পঞ্চাশ বছর আগে (এখন ২০০৫) ভারতের গ্রামে গ্রামে টেলিভিশন ঢোকেনি, রেডিও--ট্রানজিসটার ঢুকতে শুরু করেছে, কিন্তু তারও আগে গ্রামে ঘরে সন্ধেবেলা যখন মানুষের বিনোদনের প্রায় কিছুই ছিল না, রামায়ণ পাঠ শোনা তাদের আপ্লুত করত। শৈশবে আমরা যখন প্রতিটি গ্রীষ্মে মামাবাড়ি যেতাম, কালাদাদু নামে পাড়াতুতো এক দাদুর তুলসীমঞ্চে চাটাইয়ের ওপর বসে রামায়ণ পাঠ শুনতাম। রামায়ণের রাম ও অন্যান্য রাজপুত্তুররা, মুনি ঋষিরা শুধু না,—চোখের সামনে ভেসে উঠতো আকাশ ধোঁয়া করে আসা তাড়কারাক্ষসী, বা মুনি ঋষিদের যজ্ঞ পন্ড করা রাক্ষসের দল, মায়াবী হরিণ, জটায়ু, কিষকিন্ধ্যার বানর, আকাশের সীতা, চেড়ির দল, সমুদ্র, সোনার লঙ্কা, উড়ন্ত রথ ইত্যাদি ইত্যাদি। তিরধনুতে অনায়াসে রাক্ষসবধ করতে পারেন যে রাম-লক্ষ্মণ তাঁরা তো আমাদের মত শিশুর কাছে বীরের মর্যাদা পাবেনই এবং রামায়ণ বারবার শুনতে আমাদের ভাল লাগবে। শুধু কালাদাদুর কাছে না, মাঝে মাঝে গাঁয়ে-ঘরে পট দেখাতে আসতেন যে পটুয়ার দল, যাদের ভিখিরি বলে চিহ্নিত করা হত—তারাও পট খুলে যখন গান গেয়ে রামকথা শোনাতেন আমরা মুগ্ধ হয়ে সেই পটের ছবি দেখতাম আর রামায়ণ শুনতাম। পটই তো ছিল তখন গ্রামে ঘরে লোকসংস্কৃতি-সিনেমা।

পরে টেলিভিশনে (বিংশ শতাব্দীর আটের দশকে) যে রামায়ণ দেখানো হয় তার জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ ঐ রামায়ণে যতটা না মৌলবাদী আবেদন ছিল--তার চেয়ে বেশী ছিল ঐ রামায়ণ দেখতে দেখতে আমাদের শৈশবে ফিরে যাওয়া। আর অন্য কারণ রামায়ণ প্রেমের গল্প। রামায়ণের অন্য অনেক দিক আছে সে কথায় আমরা পরে আসব। এ কথা সত্যি রাম সীতা ছাড়া অন্য কোন মেয়ের প্রতি আকৃষ্ট হননি। ব্যাপারটা যুগ যুগ ধরে ভারতীয় মেয়েদের ভাল লেগেছে। স্বামী তাকেই শুধু ভালবাসবে, অন্য কাউকে না। লক্ষ্মণের প্রতি সীতার একটা অদ্ভুত টান আছে। কিন্তু সীতা তা বুঝতে দেন না। লক্ষ্মণের বৌদির প্রতি টান বেশ গভীর। নিজের স্ত্রী উর্মিলাকে অযোধ্যায় ছেড়ে লক্ষ্মণ কিন্তু দাদা-বৌদির অনুসরণ করেন --যতটা না দাদার টানে তার চেয়ে বেশি বৌদির টানে। ইউরোপের

রেনেশাঁ প্রভাবিত আধুনিক যুগ আসার আগে দেওরের প্রতি টান বা ভালবাসা সনাতন হিন্দুধর্মের বিধিনিষেধের বেড়ার মধ্যে ভারতীয় মেয়েদের একটু মুক্তি দিত। যে কোনো ভারতীয় পরিবারে বাবা-মা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন,এই ২০০৫ সালেও যদি কোন অদৃশ্য টানে বাঁধা থাকেন—তাতে রামায়ণের প্রভাব কম না।

রামায়ণের প্রভাব শুধু হিন্দুদের মধ্যে না, মুসলিমদের মধ্যেও আছে, রামকে নিয়ে যে মুসলিম মেয়েরা বিয়ের গীত বাঁধেন—তাঁরা জানেন না বিজ্ঞান-প্রযুক্তির এই উন্নত-যুগেও হিন্দুমৌলবাদীরা তাঁদের কাছ থেকে রামকে কেড়ে নিতে চাইছে। রাম শুধু হিন্দু মৌলবাদীদের না, রামকে নিয়ে এ দেশের আদিবাসীরা রামায়ণ লিখেছেন, গান বেঁধেছেন। সংস্কৃতির সম্পর্কই রামকথাকে আদিবাসী ও নানা উপজাতি মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছে। লেখা-পড়া না জানা আদিবাসী বা উপজাতির মানুষ স্মৃতি থেকে রামায়ণ বা রামকথা উদ্ধার করতে পারেন, একের মুখে শুনে আরো দশজন রামগান করতে পারেন। আর এ-ভাবেই মুখ ফেরতা রামায়ণ—এক রামায়ণ থেকে অসংখ্য রামায়ণ হয়ে ওঠে, যে যার অঞ্চলের রীতিনীতি, সংস্কৃতি, প্রথা ও পরিবেশ অনুযায়ী রামকথার গল্প বদলে বদলে যায়। বদলে যায় বলেই তাতে বৈচিত্র আসে। এক রামায়ণের অসংখ্য পাঠকৃতি তৈরি হয়। আদিবাসীদের রামায়ণে আদিবাসীবিশ্বের দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ পায়; আদিবাসী রামায়ণে আদিবাসীদেরই দেশজ প্রকৃতি ও সংস্কৃতি প্রকাশ পায়। মুন্ডা, গোন্ড, কোরকু, কোল, শবর, বোন্ডেদের রামকথা একেকরকম। যে যার মত রামকথা তৈরি করে নিয়েছে। মূল রামায়ণ থেকে যার দুরত্ব-ও আছে এসব রামকথায় সম্পূর্ণ রামায়ণ নেই। না থাকারই কথা,কারণ এসব রামায়ণ মুখ ফেরতা রামায়ণ, স্মৃতি থেকে স্মৃতিতে স্থানান্তরিত রামায়ণ, যা ঐসব আদিবাসী ও উপজাতির মানুষ পূর্বপুরুষদের মুখ থেকে বা বোহেমিয়ান গোঁসাইদের মুখ থেকে শুনেছে। এইসব আদিবাসী ক্ষুদে রামায়ণ বা রামকথায় রাম-লক্ষ্মণের মত বীরের জায়গা দখল করে নিয়েছে মেঘনাদ ও রাবণ। হিরোর বদলে প্রতিহিরো প্রাধান্য পেয়েছে। প্রতিনায়কের প্রতিই মানুষের সহানুভূতি প্রকাশ পেয়েছে।

মধ্যভারতে ও উত্তরপূর্ব ভারতের আদিবাসীদের মধ্যে কাজ করে ভেরিয়ের এলউইন এবং জেসুইট পন্ডিত ফাদার ক্যামিল বালকে নানা পুরাণকথা, লোককথা ও রামকথা সংগ্রহ করেছেন—যা থেকে রামকথার উৎস, বিবর্তন ও ছড়িয়ে পড়ার অনেক কথা জানা যায়। ইন্দো-আর্য, দ্রাবিড় ও নানা আদিবাসী ভাষার রামকথা পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণ, বৌদ্ধ ও জৈনদের রামকথা-ও পাওয়া যায়। বক্তব্যে সেসব রামকথা বা রামায়ণের কোন মিল নেই। একেক অঞ্চলের রামায়ণ একেক রকম। তাদের লোকায়ত ও আদিবাসী রূপ ভিন্ন। টেলিভিশনে আমরা যে রামায়ণ দেখছি তাতে ইতিহাসের উপাদান না থাকতে পারে, না থাকতে পারে প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান—কিন্তু রামায়ণ যে পৌরাণিক কাহিনী তা আমরা সবাই স্বীকার করি। আর কোনো মিথ ঐতিহাসিক উপকরণ ছাড়া তৈরি হতে পারে না যেহেতু মিথে সাধারণ মানুষের উপলব্ধি প্রতিফলিত হয়। কোন সম্প্রদায়ের পারস্পরিক সম্পর্কের নিদর্শন এ থেকে পাওয়া যায়। যেমন কোন আদিবাসী উপজাতির রামায়ণ থেকে আমরা সেই উপজাতির সমাজ বিন্যাসের কথা জানতে পারি। সমাজের আদলেই সেই মুখ ফেরতা

রামায়ণ বেঁচে থাকে। এইসব রামায়ণ বা রামকথা থেকে আমরা কোন উপজাতির সামাজিক আচার আচরণের কথাও জানতে পারি। এইসব রামায়ণ থেকে ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতির অনেক কথা আমরা জানতে পারি।

বাল্মিকী রামায়ণে রাম

বাল্মিকী রামায়ণ শুরু হচ্ছে এইভাবে : তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করে তমসা নদী তীরের আশ্রমে বাল্মিকী বসে আছেন। দেবর্ষি নারদ তাঁর কাছে এলেন। বাল্মিকী নারদের কাছে রামের আগে যে রামায়ণ সেই রামায়ণের রামকথা শুনলেন। রাম পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে পৃথিবীর সব পাপ ধুয়ে মুছে দেবেন, রাক্ষসদের বিনাশ করে ধর্মরাজ্য স্থাপন করবেন। বাল্মিকী মাত্র একশ শ্লোকে রামায়ণের আদিকান্ডের প্রথমেসর্গে ইক্ষবাকু বংশের রাজা দশথের পুত্র হয়ে রাম যে জন্মাবেন তার পূর্বাভাস দেন। পৃথিবীর অন্যান্য মহাকাব্যগুলিতেও আমরা এ-রকম ভবিষ্যতবাণী শুনি। ফলে রাম জন্মানোর আগেই বীজাকারে রামের বর্ণনা আমরা পেয়ে যাই আদিকান্ডে। পন্ডিতদের অনুমান খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় বা দ্বিতীয় শতক থেকে শুরু করে খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয়-তৃতীয়-চতুর্থ শতক পর্যন্ত অর্থাৎ ৬০০-৭০০বছর ধরে রামায়ণ রচনা করেছেন বিভিন্ন চারণকবি। মূল রামায়ণ, যেটিকে আমরা বাল্মীকির রামায়ণ বলি তার অযোধ্যাকান্ড থেকে লঙ্কাকান্ড খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে লেখা হয়ে যায়। পরে মূল রামায়ণের সঙ্গে আদিকান্ড ও উত্তরকান্ড যুক্ত হয়। অর্থাৎ সম্রাট দারায়ুস- ৫১৬ খ্রীষ্টপূর্বাদে যখন উত্তর-পশ্চিম ভারতে প্রবেশ করেন, তখন থেকে সম্রাট অশোকের সময় পেরিয়ে গুপ্তযুগ পর্যন্ত রামায়ণ লেখা হতে থাকে। এসময় শক, পার্থিয়ান, কুষাণ, গ্রিকরা ভারত অভিযানে আসে। মেগাস্থিনিস, হিউয়েন সাঙ, ফা-হিয়েন প্রভৃতি পরিব্রাজক ভারতবর্ষে আসেন। শক, কুষাণ, সাতবাহন সাম্রাজ্য, মৌর্য ও গুপ্তযুগ পর্যন্ত রামায়ণ রচিত হয়। মূল রামায়ণের রাম বিষ্ণুর অবতার না, তিনি মানুষ। এছাড়া রামায়ণে এমন কিছু কল্পনা করেছেন চারণ কবিরা যা সাম্প্রতিক কালের কল্পবিজ্ঞান কাহিনীর মতো; যেমন পুষ্পকরথে আকাশপথে উড়ে যাওয়া, মেঘের আড়াল থেকে মেঘনাদের যুদ্ধ, কুম্ভকর্ণ ছ'মাস ঘুমোন একদিন জাগেন আবার ছ'মাস ঘুমোন। রাম-রাবণ যুদ্ধে যেসব অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করেছেন সেরকম অস্ত্রের ব্যবহার আমরা সাম্প্রতিক কালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে আফগানিস্থান ও ইরাকে ব্যবহার করতে দেখেছি। বানর সেনাদের সমুদ্রে সেতুবন্ধন। রামায়ণে যা ছিল কবির কল্পনায়, সাম্প্রতিকালে তা ঘটেছে বাস্তবে। সে যাই হোক আমাদের বিষয় রাম। রাম আমাদের কাছে মানুষ, আবার রাম আমাদের কাছে বিষ্ণুর অবতার অর্থাৎ তিনিই স্বয়ং ভগবান। ভারতীয়দের কাছে রামকথা অর্থাৎ রামায়ণ একদিকে যেমন এপিক বা মহাকাব্যের মর্যাদা পায়, অন্যদিকে ধর্মপ্রাণ ভারতীয়দের কাছে ধর্মগ্রন্থের মর্যাদা পায়। রামায়ণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ভারতীয় মানসিকতার কথা ভাবা যায় না। আর ঐ রামায়ণের প্রধান নায়ক রামের যে দোষগুণই থাক রামকাহিনীর মধ্য দিয়ে আপামর ভারতবাসী ত্যাগ, প্রেম ও সেবার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়। রামচরিত মানুষকে সেই কল্পলোকে বা ইউটোপিয়ার জগতে নিয়ে যায় যেখানে জীবনের সত্যের জন্য মানব ধর্মের জন্য, মানুষের সেবা ও কল্যাণের জন্য

অনাসক্ত জীবন চাই। মানুষ যত মর্ডান হয়ে পোস্টমর্ডান পৃথিবীর দিকে এগোচ্ছে সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনে তাঁরা ততই রামের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে রাম রাজ্যের কল্পনা করছেন। রামের জীবন হয়ে উঠছে তাঁদের আদর্শ বা প্রতীক। কারণ, রাম গুণী, বীর, ধর্মপ্রাণ, কৃতজ্ঞ, সত্যবাদী, দৃঢ়চেতা, চরিত্রবান, বিদ্বান, আত্মবান, জিতক্রোধ, প্রিয়দর্শী, দ্যুতিমান, পরশ্রীকাতর না, প্রজাদের কথা ভাবেন—এক আধারে এত গুণের সমাবেশ—অতএব রাম চরিত্রের মধ্যে ভারতবাসী মাত্রেই নিজেকে ও অন্যকে খুঁজবেন তা স্বাভাবিক। প্রায় দুই-আড়াই হাজার বছর রামায়ণ বা রামকথার মধ্য-দিয়ে ভারত-সংস্কৃতি নির্মাণ প্রবাহমান। ভারতীয় সংস্কৃতির একটি অন্যতম আইডেনটিটি রামায়ণ। রামায়ণকে আশ্রয় করেই ভারতের বিভিন্ন জাতি, উপজাতি আজও নির্মাণ করে চলেছেন নিজেদের রামায়ণ। পোর্স্টমডার্ন চোখে এইসব রামায়ণকে বলা চলে বাল্মীকি রামায়ণের ডিকনস্ট্রাকশন বা বিনির্মাণ। রামকে কেন্দ্র করে সারাভারতবর্ষে ও ভারতের বাইরে (যেসব অঞ্চলে একসময় হিন্দুসংস্কৃতি প্রসারলাভ করেছিল) ছড়িয়ে আছে রামের অসংখ্য পাঠকৃতি। বিভিন্ন অঞ্চল ভিত্তিক, ভাষাভিত্তিক, সামাজিক আইডেনটিটি ভিত্তিক রামের পাঠকৃতি গড়ে উঠেছে। পৃথিবীর অন্য কোন মহাকাব্যের নায়ককে কেন্দ্র করে এত পাঠকৃতি গড়ে ওঠেনি। ব্রিটিশ বিরোধী ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে গান্ধিজি ও ভারতীয় অন্যান্য নেতারা ও রামায়ণ ব্যবহার করেছেন।

রামের জন্মের আগে রামের কথা বলে নারদ বিদায় নেবার পর একদিন ভোরবেলা শিষ্য ভরদ্বাজের সঙ্গে বাল্মীকি যখন তমসা নদীতে স্নান করতে চলেছেন হঠাৎ শুনতে পেলেন ক্রৌঞ্চমিথুনের আর্তনাদ। শরবিদ্ধ এক ক্রৌঞ্চ তার সামনে এসে পড়ল। রক্তে ভেজা ডানা। ক্রৌঞ্চ মারা গেল! প্রিয় বিরহে ক্রৌঞ্চীর আর্তনাদ বাল্মীকিকে স্পর্শ করল। তিনি দেখলেন তাঁর সামনে একজন ব্যাধ দাঁড়িয়ে আছে। বিমর্ষ বাল্মীকি অভিশাপ দিলেন:

মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনদেকমবধীঃ কামমোহিতম্।

ক্রৌঞ্চমিথুনের এই বিরহ ব্যথার সুরই রামায়ণ মহাকাব্যের থীম মিউজিক বা মূল সুর। স্বয়ং ব্রহ্মা বাল্মীকিকে দেখা দিয়ে রামায়ণ লিখতে বললেন। বাল্মিকী পাঁচশ সর্গে বিভক্ত চল্লিশ হাজার শ্লোকে রামায়ণ রচনা করলেন। রামায়ণ এক অর্থে রামের জীবন কাহিনী। রামায়ণ হিন্দুদের কাছে বেদের সমান।

রামায়ণের অযোধ্যাকান্ডে আমরা দেখি দশরথের সভায় বিশ্বামিত্র মুনি এসেছেন। রাজা দশরথের কাছে রাম ও লক্ষ্মণকে চাইছেন যজ্ঞ পন্ডকারী রাক্ষসের বধের জন্য। রাম লক্ষ্মণ তখন বালক। রাম তখন বারো বছরের বালক। রাজা দশরথ ভয় পেলেন। প্রথমে রাজী না হয়েও পরে বিশ্বামিত্রর ভয়ে রাজী হলেন রাক্ষস বধে রামলক্ষ্মণকে পাঠাতে।

বিশ্বামিত্র-র সঙ্গে যেতে যেতে রাম জীবনের নানা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গেলেন। সরযূ নদী তীরে বিশ্বামিত্র রাম লক্ষ্মণকে তাঁর সব তপস্যা ও সিদ্ধি দান করলেন। রাম যাতে পৃথিবীর সকল জীবের রক্ষাকর্তা হয়ে ওঠেন। রাম-লক্ষ্মণ প্রথমে অঙ্গদেশে এলেন, তারপর গঙ্গা ও সরযূর সঙ্গমস্থলে, তারপর প্রবেশ করলেন নদীর দক্ষিণতীরের গভীর অরণ্যে। বিশ্বামিত্র বললেন, এ অরণ্যে তাড়কা রাক্ষসী থাকে। তাকে বধ করতে হবে। রাম যখন

নারী হত্যার পাপ হবে ভাবছেন, বিশ্বমিত্র রামকে বললেন, এককালে এই অরণ্যঅঞ্চলে সমৃদ্ধ জনপদ ছিল, তাড়কারাক্ষসীই তা ধ্বংস করেছে। অতএব এই রাক্ষসী বধে স্ত্রী হত্যাজনিত পাপের ভয় নেই। রাম তাড়কাকে বধ করলেন।

এরপর বিশ্বামিত্র রামকে দিব্যঅস্ত্র দান করলেন। দিব্যঅস্ত্রসমূহ স্বমূর্তি ধারণ করে রামকে বললেন, রামের ইচ্ছে মত তারা কাজ করবে। রাম তাদের বললেন: যখনই স্মরণ করব চলে এসো। আপাতত আমার মানসলোকে থাকো। রামায়ণের অন্যান্য অস্ত্রগুলি আধুনিকপ্রযুক্তিতে তৈরি সম্ভব হলেও দিব্যঅস্ত্র এখনো তৈরি হয়নি। তবে বোঝাই যাচ্ছে আগামী দিনের সশস্ত্র-রোবট দিব্যঅস্ত্র-র জায়গা নেবে। রাম কিন্তু সশস্ত্র রোবটের মতো দিব্যঅস্ত্রর সাহায্য পেয়েছিলেন, রাবণবধে যার প্রয়োগও ঘটিয়েছিলেন। (রিমোটকন্ট্রোলে?) বারো বছরের বালক রাম বিশ্বামিত্র মুনির কাছে নানারকম ভয়ঙ্কর দিব্যঅস্ত্র পেয়েছিলেন। সমাজকে পাপ মুক্ত করার জন্য রামকে এইসব অস্ত্র দেওয়া হয়েছিল। রামায়ণের এই প্রথা কিন্তু আমাদের এই বিংশ-একবিংশ শতাব্দীর পৃথিবীতেও বহাল। বিশ্বামিত্র বলেছিলেন: উপযুক্ত আধারে তিনি দিব্যাস্ত্র দান করে পরিতৃপ্ত। আমরা দেখছি রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচটি রাষ্ট্রের হাতে মূলত ভেটো প্রয়োগের অধিকার সমেত পরমাণু অস্ত্র। পরমাণু অস্ত্রের রিমোটকন্ট্রোলের বোতাম পাঁচটি রাষ্ট্রের হাতে।

সিদ্ধাশ্রমে এসে বিশ্বামিত্র অন্যান্য মুনি ঋষিদের নিয়ে যজ্ঞ শুরু করলেন। ছ'দিন ঘুম নেই চোখে, রামলক্ষ্মণ পাহারা দিলেন। রাক্ষসেরা যজ্ঞ পন্ড করতে এলে বধ করলেন। তাড়কা রাক্ষসীর ছেলে মারীচকে না মেরে শরাঘাতে তাকে আটশ মাইল দূরে সাগরে নিক্ষেপ করলেন। যজ্ঞ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হওয়ায় বিশ্বামিত্র মুনি খুশি হলেন। এরপর বিশ্বামিত্র দু'ভাইকে নিয়ে মিথিলায় এলেন। একটি নির্জন আশ্রম দেখিয়ে বিশ্বামিত্র রামকে ঋষি গৌতম, তাঁর স্ত্রী অহল্যা ও ইন্দ্রের হাতে অহল্যার ধর্ষণের কথা বললেন। ঋষি গৌতমের অহল্যাকে অভিশাপের কথা জানালেন। রামের পদস্পর্শে অহল্যা মুক্তি পেলেন। বাল্মিকী রামায়ণে অহল্যার শাপমুক্তি ব্রাহ্মণ্য বা ভার্গব প্রক্ষেপ। এই প্রক্ষেপ ঘটানো হয়েছিল মানুষ রামকে দেবতায় রূপান্তরিত করার জন্য। তবে একটা জিনিষ দেখা যাচ্ছে, রামায়ণ রচিত হওয়ার সময় ধর্ষিতা স্ত্রীকে সংকার করে সমাজে ফিরিয়ে নেওয়ার রাস্তা খোলা ছিল। সমাজের উচ্চবর্গে ব্যভিচার ছিল। অহল্যাকে কোন নিম্নবর্গের মানুষ ধর্ষণ করেনি, উচ্চবর্গের দেবতা ইন্দ্র করেছেন এবং ছলনার আশ্রয় নিয়ে। পাপাচারে ভরে উঠেছিল উচ্চবর্গের সমাজ।

অহল্যার শাপমুক্তির পর রাম লক্ষ্মণকে নিয়ে বিশ্বামিত্র রাজর্ষি জনকের যজ্ঞশালায় এলেন। বস্তুত এটি জনকরাজার পালিতাকন্যা সীতার বিবাহসভা। হলকর্ষণের সময় (সীতান) সীতা উঠে এসেছিলেন বলে তাঁর নাম সীতা। সীতা বীর্যবতী ছিলেন। জনকরাজার উঠোনে পড়ে থাকা হরধনু একমাত্র তিনিই ওঠাতে পেরেছিলেন, তাই সীতাকে বিয়ের শর্ত ছিল--যিনি এই হরধনু তুলে ভাঙতে পারবেন তিনিই সীতাকে বিয়ে করতে পারবেন। রাম অনায়াসে হরধনু ভাঙলেন। ফলে রামের সঙ্গে সীতার বিয়ে হল। রাজা দশরথ ভরত, শত্রুঘ্ন ও অন্যান্যদের নিয়ে মিথিলায় এসে নব বরধূকে অযোধ্যায় নিয়ে গেলেন। বিশ্বামিত্র

সকলের কাছে বিদায় নিয়ে হিমালয়ের তপস্যার জন্য চলে যান। বিশ্বামিত্র রামের অস্ত্রগুরু ছিলেন। বিশ্বামিত্র রামকে শুধু অস্ত্রশিক্ষা দেননি, দিব্যাস্ত্রদান করেছেন এবং ভারতের ইতিহাস সম্পর্কে পাঠ দিয়েছেন। বিশ্বামিত্র-র সঙ্গে ঘুরতে ঘুরতে রাম ভারতের বহু জনপদ ও আশ্রমের কথা জেনেছেন, অনেক আখ্যান শুনে ভারত সম্পর্কে তাঁর প্রাথমিক পরিচিতি ঘটেছে। রাম হরধনু ভেঙেছেন শুনে, শিবভক্ত মুনি পরশুরাম কুঠার কাঁধে এলেন রামের শক্তি পরীক্ষা করতে। রাম পরশুরামের ঔদ্ধত্যের সমুচিত জবাব দিলেন। রাম পরশুরামের তপোবল নষ্ট করে দিলেন। বিয়েতে রাম বিভিন্ন সামগ্রির সঙ্গে দাসদাসী ও একশো কন্যা যৌতুক পান। ঐ সময়ের সমাজেও কনেপণ প্রচলিত ছিল। রাম ও সীতার বিয়ের উৎসব শেষ হওয়ার পর দীর্ঘ বারো বছর রাম-সীতা সুখী দাম্পত্য জীবন কাটালেন। যৌতুক পাওয়া একশকন্যার কপালে কি ঘটল জানা যায় না। এ-সময় রাম বিনয়ী, রাম বীর, রাম দক্ষ প্রশাসক, রাম জ্ঞানী, রাম হয়ে উঠলেন প্রজাদের প্রিয়। বোঝাই যাচ্ছে রামায়ণ রচনার কালে রাজারা শুধু ধর্মের রক্ষক ছিলেন না, প্রজাপালনেও তাঁরা ছিলেন দক্ষ। রাজায় প্রজায় প্রীতির সম্পর্ক ছিল।

রামের আর্বিভাব পৃথিবীতে রাবণ বধের জন্য। দশরথ চাইলেন রামকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করতে। কিন্তু রাজা দশরথের মনে একটা ভয় ছিল। কৈকেয়ীকে বিয়ে করার সময় কৈকয় রাজকে তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন কৈকেয়ীর পুত্রই রাজসিংহাসনে বসবে। ফলে রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করার আগে ভরত ও শত্রুঘ্নকে মামাবাড়িতে পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু কৈকেয়ী রাজাকে দুটি বরের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে—এক বরে ভরতের যৌবরাজ্যে অভিষেক দ্বিতীয় বরে রামকে চৌদ্দ বছর বনবাসে পাঠাতে বললেন। রামস্নেহে অন্ধ রাজা দশরথ রামকে সেকথা কিছুতেই বলতে পারলেন না। কারণ রামের অভিষেক ঘোষণা করা হয়ে গেছে এবং প্রথা অনুসারে রাম-সীতা শুদ্ধচিত্তে মৌনব্রত নিয়ে বিষ্ণুমন্দিরে তৃণশয্যায় শয়ন করেছেন। দশরথকে ইতঃস্তত করতে দেখে কৈকেয়ী রামকে যখন দশরথের নাম করে তাঁর প্রার্থিত বর দুটির কথা বললেন রাম আকাশ থেকে পড়লেন। বিনা মেঘে বজ্রপাত মতো দুটি ঘোষণা। এসময় রাম আঘাত পেয়ে বলেন, পিতার কথায় তিনি আগুনে প্রবেশ করতে পারেন। রাজা নিজে কেন তাঁকে ভরতের অভিষেকের কথা বললেন না। এরপর তিনি যে কথাটি বলেন তা কিন্তু আরো মর্মান্তিক : ভরতের জন্য আমি খুশি হয়ে 'সীতা, রাজ্য, প্রাণও দিতে পারতাম।' অর্থাৎ ব্যক্তি হিশেবে সীতার কোন আইডেনটিটি তাঁর কাছে নেই, সীতা যেকোন দ্রব্যসামগ্রির মতো, তাঁকে দান করা চলে! বোঝাই যাচ্ছে ঐ-সময়ের সমাজব্যবস্থা নারীর কোন সামাজিক আইডেনটিটি ছিল না। রাম কৈকেয়ীকে বলেন: আমি ধর্মের জন্য পিতৃসত্য পালন করব বনবাসে যাবো। এ-সময় লক্ষ্মণ তার সঙ্গে যেতে চাইলে প্রথমে আপত্তির পর রাম রাজী হয়ে যান। কিন্তু সীতাকে নিয়ে যাওয়ার কোন আগ্রহ তাঁর ছিল না। সীতা রামকে ভালোবাসতেন। তাই রামের বিরহে মৃত্যু ঘটবে সীতা জানালেন এবং বনবাসে যেতে চাইলেন। অনায়াসে তিনি রাজপ্রাসাদে সুখে দিন কাটাতে পারতেন। সীতার যুক্তির কাছে হার মেনে রাম তাঁকে সঙ্গে নিতে রাজী হন। লক্ষ্মণ উর্মিলাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারতেন। তা কিন্তু নিলেন না।

রাম বনবাসে যাবেন, শোকসাগরে ভাসছে অযোধ্যা। রামের বিদায়ের সময় রাজা দশরথের তিনশতএকান্ন জন স্ত্রী উপস্থিত, অবশ্যই কৈকেয়ী বাদে। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে সমাজে বহু বিবাহ প্রথার চল ছিল। উচ্চবর্গের মানুষ যটি খুশি বিয়ে করতে পারতেন। একমাত্র মুঘল সম্রাটদের হারেমে এরকম সংখ্যায় স্ত্রী থাকার কথা আমরা জানি! আরো অদ্ভুত ব্যাপার এত সংখ্যক স্ত্রী থাকা সত্বেও রাজা দশরথের পুত্র-কন্যা ছিল না। কৌশল্যা, কৈকেয়ী ও সুমিত্রার যে চারসন্তান রাম, ভরত, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন—তাঁদের জন্ম ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির মাধ্যমে। সাম্প্রতিককালের মতো স্পার্ম-ব্যাঙ্ক তখন তো ছিল না। রাম লক্ষ্মণ ও সীতাকে নিয়ে অযোধ্যা ছেড়ে চলেছেন। পেছনে পেছনে চলেছেন অযোধ্যাবাসী। সারথি সুমন্ত্র রথে করে নিয়ে চলেছেন রাম লক্ষ্মণ সীতাকে। কিছুদূর এসে রাম অযোধ্যাবাসীকে ফিরে যেতে বললেন।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে রমণীয় তমসা নদীর তীরে প্রথম রাত বৃক্ষতলে তৃণশয্যায় কাটিয়ে, পরেরদিন তাঁরা এলেন শৃঙ্গবেরপুরে। এখানে নিষাদ রাজা গু[illegible] নানারকম খাবার-দাবার, ফলমূল, পানীয়, পোশাক আশাক নিয়ে রামকে অভ্যর্থনা জা[illegible]লেন। রাম বললেন, তাঁরা চীরধারী তপস্বী। গুহকের দান নেবেন না। গুহক তাঁদের রথের ঘোড়াদের জন্য খাদ্য ও পানীয় দিলে ভালো হয়। গুহক তাই করলেন। এখানে প্রশ্ন স্বাভাবিক, নিষাদ রাজা গুহক নিম্নবর্গের মানুষ ছিলেন বলেই কী রাম লক্ষ্মণ সীতা তাঁদের খাবার-দাবার, ফলমূল পানীয় গ্রহণ করলেন না? গুহক চন্ডাল বলেই কি বর্ণবিদ্বেষী রাম তাঁর আহার গ্রহণ করলেন না? বনবাস জীবনে তাঁরা কিন্তু অন্যান্য মুনি-ঋষিদের দেওয়া ফলমূল গ্রহণ করেছেন। সেদিন গঙ্গাজল পান করে রাম সীতা তৃণশয্যায় কাটালেন।

পরেরদিন ভোরে রাম সুমন্ত্রকে বিদায় দিলেন। নৌকায় তাঁরা গঙ্গা পার হয়ে; অন্য তীরে এলেন। তিনদিন জল পান করেছিলেন। আজ শিকার মিলেছে। মাংস খাবেন!.....যমুনার উত্তর তীরে প্রয়াগের কাছে বৎসদেশ পৌঁছোলেন। এ-সময় রাম আশঙ্কা প্রকাশ করেন তাঁদের অনুপস্থির সুযোগে কৈকেয়ী কৌশল্যা ও সুমিত্রাকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করতে পারে। সংসারে ধর্ম ও অর্থের চেয়ে কামের প্রতিপত্তি বেশি। কৈকেয়ীর প্রতি মহারাজের কামাসক্তিই তাঁদের যত দুর্দশার কারণ। অতএব লক্ষ্মণ অযোধ্যায় ফিরে যাক। যাতে কৌশল্যা ও সুমিত্রার প্রাণ বাঁচে। এ-ক্ষেত্রে রামের অবতার ভাবমূর্তি খসে পড়ে। আর পাঁচজন সাধারণ মানুষের মতোই তাঁর ক্রোধ প্রকাশ পেয়েছে।

চতুর্থদিন রাম লক্ষ্মণ সীতা এলেন ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে। অরণ্য যাত্রার পঞ্চমদিনে এলেন চিত্রকূট পর্বতে। কাঠের ভেলা তৈরি করে যমুনা পার হয়ে চিত্রকূটে বাল্মিকীর আশ্রমে এলেন। চিত্রকূটের সৌ[illegible]র্য মুগ্ধ রামসীতা এখানেই বনবাসে জীবন কাটাবেন স্থির করলেন। লক্ষ্মণ একটি কুটির নির্মাণ করলেন।

প্রায় [illegible] হপ্তা কেটে গেছে। বনের ফলমূল হরিণমাংস খেয়ে তাঁদের জীবন কাটছে। হঠাৎ একদিন তাঁরা দেখেন প্রচুর সৈন্যসামন্ত নিয়ে ভরত সেদিকে আসছেন। লক্ষ্মণ ভেবেছিলেন ভরতের কোন কুমতলব আছে। রাম তাকে আশ্বস্ত করেন—ভরতকে সন্দেহ করা উচিত না। চীরধারী ভরত ও শত্রুঘ্ন রামের কাছে এসে পদতলে বসেন। রাজা দশরথের

মৃত্যুসংবাদ দেন। রাম মন্দাকিনী নদীতে পিতৃতর্পণ করেন।

রামকে অযোধ্যায় ফেরানোর সমস্ত প্রয়াসে ব্যর্থ হওয়ার পর বশিষ্ঠ মুনির উপদেশ মতো ভরত রামের পাদুকা নিয়ে অযোধ্যায় ফিরে গেলেন।

রাম স্থান পরিবর্তন করে, একরাত্রি অত্রি মুনির আশ্রমে কাটিয়ে দন্ডকারণ্যে প্রবেশ করলেন। এখানে বিরাধ নামে এক রাক্ষসের সঙ্গে রাম লক্ষ্মণের যুদ্ধ হয়। বিরাধ সীতাকে নিজের কোলে তুলে নিয়েছিলেন। যুদ্ধে বিরাধের মৃত্যু হয়। মৃত্যুর সময় বিরাধ রাম লক্ষ্মণকে শরভঙ্গ মুনির আশ্রমে যেতে বলেন। রামের প্রতীক্ষাতে মুনি ছিলেন। রামকে দেখতে পেয়ে তাঁর সামনে দেহত্যাগ করেন। দেহত্যাগ করার আগে রামকে সুতীক্ষ্ণ মুনির আশ্রমে যেতে বলেন। সুতীক্ষ্ণ মুনিও রাম দর্শনের পর দেহত্যাগ করেন। সুতীক্ষ্ণ মুণির আশ্রম থেকে যাত্রা করার সময় সীতা রামলক্ষ্মণকে অযথা রাক্ষস বধ করতে বারণ করেন। সীতার মনে হয়েছিল রাক্ষসবধ করতে গিয়ে রামলক্ষ্মণের বিপদ হতে পারে। কিন্তু রাম সীতাকে বলেন, আর্ত শরণাগত হলে তাকে রক্ষা করা ক্ষত্রিয় ধর্ম। মুনি, ঋষি, তপস্বীরা তাঁদের শরণাগত। অতএব রাক্ষসবধ না করে উপায় নেই। বিভিন্ন আশ্রমে ঘুরে ঘুরে কোথা দিয়ে যে বনবাসের দশবছর চলে গেল তাঁরা বুঝতে পারেন নি। বিভিন্ন আশ্রমে বা নিজেদের বানানো পর্ণকুটিরে—কোথাও বেশিদিন তাঁরা থাকেন নি। সুতীক্ষ্ণ মুণির আশ্রমে ফিরে এসে দুবছরের বেশি ছিলেন। তারপর অগস্ত্য মুনির আশ্রমে যান। অগস্ত্য মুনিও নানারকম দুলর্ভ অস্ত্র রামকে দেন। রাম অগস্ত্য মুনিকে শান্তিতে বসবাসের জন্য একটি স্থান নির্বাচন করে দিতে বলেন। অগস্ত্য তাঁদের পঞ্চবটী বনে যেতে বলেন। গোদাবরী নদীর তীরে পঞ্চবটীতে রামলক্ষ্মণ সীতা এলেন। পথে রাজা দশরথের বন্ধু জটায়ুর সঙ্গে তাঁদের দেখা হল। জটায়ু তাঁদের পঞ্চবটিবনে থাকতে বললেন।

এই পঞ্চবটিতে রাম লক্ষ্মণ সীতার জীবনে আরেক দুর্ভাগ্যের শুরু হবে।

বনবাসী রাম লক্ষ্মণকে দেখে রাবণের বোন সূর্পনখা প্রেমার্ত হলেন। তাঁদের বিয়ে করতে চাইলেন। রামের নির্দেশে লক্ষ্মণ শূর্পনখার নাক ও কান কেটে দিলেন। শূর্পনখা তাঁর দুর্দশার কথা ভাই খর ও দূষণকে বলতে তারা চোদ্দহাজার রাক্ষসসেনা নিয়ে রাম লক্ষ্মণকে আক্রমণ করলেন। রাম তাদের বধ করলেন।

খর ও দূষণের মৃত্যু দেখে শূর্পনখা লঙ্কায় রাবণের কাছে গিয়ে সমস্ত ঘটনা জানালেন। রাবণ প্রথমে জনস্থানে আসতে রাজী ছিলেন না। শূর্পনখা রাবণের কামার্ত স্বভাবের কথা জানতেন। সুন্দরী সীতার বর্ণনা এমন ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে দিলেন যে রাবণ জনস্থানে মায়াবী সন্ন্যাসী মারীচের আশ্রমে এলেন। মারীচ রামের শক্তির কথা জানতেন। রাবণকে নিষেধ করলেন সীতা হরণে। জানালেন রাম দেখতে সাধারণ মানুষের মতো হলেও সামান্য মানুষ না। রাবণের বিপদ হবে। রাবণ লঙ্কায় ফিরে যাক। কিন্তু বোন শূপর্ণখার কান্নাকাটিতে আবার মারীচের আশ্রমে ফিরে এসে, মারীচকে ভয় দেখিয়ে মায়ামৃগ সাজতে বাধ্য করেন। মারীচ দেখলেন রাবণের হাতে মৃত্যুর চেয়ে রামের হাতে মৃত্যু শ্রেয়। মারীচ মায়ামৃগ সেজে সীতার পর্ণকুটিরের সামনে ঘোরাঘুরি শুরু করেন। মায়ামৃগ দেখে সীতা এত মুগ্ধ হন যে তিনি রামকে হরিণটি শিকার করতে বলেন। রাম হরিণকে অনুসরণ করে গভীর অরণ্যে প্রবেশ

করেন। কিছু সময় পরে অরণ্যের গভীর থেকে মারীচ রামের স্বর নকল করে লক্ষ্মণকে আর্তস্বরে ডাকতে থাকেন। লক্ষ্মণ ইতস্তত করছেন দেখে সীতা লক্ষ্মণকে ভৎর্সনা করেন। লক্ষ্মণ বাধ্য হন দাদার উদ্ধারে অরণ্যে প্রবেশ করতে। এ-সময় ভিখিরির ছদ্মবেশে রাবণ এসে সীতাকে পুষ্পকরথে হরণ করে নিয়ে গেলেন।

পর্ণকুটিরে ফিরে রাম লক্ষ্মণ দেখেন সীতা নেই। সীতাকে চারপাশে খোঁজেন। কোথাও নেই। খুঁজতে খুঁজতে রাবণের খড়গে ছিন্ন ডানা মুমূর্ষ জটায়ুর কাছে এসে তাঁরা জানতে পারেন রাবণ সীতাকে হরণ করে নিয়ে গেছেন। জটায়ুর মৃত্যুতে তাঁরা আঘাত পেলেন। জটায়ুর অন্ত্যেষ্টি ও তর্পণ করলেন।

সীতাকে হারিয়ে রামের বিলাপ আর থামে না। লক্ষ্মণ তাঁকে সান্ত্বনা দেন। এসময় রাম একবারও ভাবেননি ইতিমধ্যেই বারোবছর দাদাকে ভালোবেসে লক্ষ্মণ উর্মিলার বিরহে দিন কাটাচ্ছে। বরং শূর্পনখা প্রথমে রামকে বিয়ে করতে চাইলে, রাম লক্ষ্মণকে দেখিয়ে শূর্পনখাকে বিয়ে করতে বলেন! রামের এই পরিহাস-এ লক্ষ্মণ কিছু মনে করেন নি। আবার রাবণের সঙ্গে যুদ্ধের সময় শক্তিশেলে লক্ষ্মণ আহত হলে—রাম বলেন, খোঁজে করলে সীতার মতো অনেক মেয়ে পৃথিবীতে পাওয়া যাবে, লক্ষ্মণের মতো ভাই পাওয়া যাবে না! কখনো ভাই, আবার কখনো সহধর্মিণী সীতা রামের কাছে ব্রাত্য হয়ে যাচ্ছেন। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে রাম রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ জড়িয়ে পড়েছিলেন যতটা না সীতার জন্য তার চেয়ে বেশি ইক্ষ্বাকু বংশের সম্মান রক্ষার জন্যে।

জটায়ুর সৎকারের পর রাম লক্ষ্মণের যুদ্ধ হয় এক ভয়ঙ্কর কবন্ধের সঙ্গে। রামের হাতে মৃত্যুতে কবন্ধের শাপ মুক্তি ঘটে। কবন্ধ রামকে সুগ্রীবের সাহায্য নিয়ে সীতাকে উদ্ধার করতে বলেন। এছাড়া রামকে শবরীর প্রতীক্ষার কথা বলেন। রাম পম্পা নদীতীরে শবরীর আশ্রমে গেলে শবরীর শাপমুক্তি ঘটে। রামের সামনে অগ্নিতে প্রবেশ করে শবরী সশরীরের স্বর্গে চলে যান। কিষ্কিন্ধ্যায় রামের সঙ্গে সুগ্রীবের দেখা হয় ও বন্ধুত্ব হয়। কিষ্কিন্ধ্যার রাজা তখন সুগ্রীবের দাদা বালী। বানর রাজা। বালী রাজ্য থেকে সুগ্রীবকে তাড়িয়ে দিয়ে তার স্ত্রীকে ভোগ করছে। রাম সুগ্রীবকে রাজ্য ও স্ত্রী উদ্ধার করে দেবার প্রতিশ্রুতি দেন। বদলে সুগ্রীবও বানর সেনার সাহয্যে রামকে সীতা উদ্ধার করে দেবার প্রতিশ্রুতি দেন। রাম বীর, রামের কাছে বিশ্বামিত্র ও অগস্ত্য মুনির দেওয়া অস্ত্র আছে, আছে ভয়ঙ্কর দিব্যাস্ত্র—তা সত্বেও বালী বধে রাম ক্ষত্রিয়ধর্ম বিরুদ্ধ কাজ করেন। গাছের আড়াল থেকে লুকিয়ে বালীকে বধ করেন। রাম জেনেশুনেই এ পাপ কাজ করেছিলেন। শুধু তাই না, যে কারণে বালীকে হত্যা করলেন, সুগ্রীব রাজত্ব ফিরে পেয়ে সেই একই পাপ কাজ করলেন বালীর স্ত্রী তারাকে অঙ্কশায়িনী করে। রাম এ ব্যাপারে নীরব। স্বার্থসিদ্ধিই তাঁর কাছে তখন বড় হয়ে দেখা দিয়েছে।

যাইহোক সুগ্রীবের নেতৃত্বে বানরসেনাদের সঙ্গে নিয়ে রামলক্ষ্মণ সমুদ্রতীরে এলেন। সমুদ্রের অন্যতীরে রাবণের লঙ্কাপুরী। সুগ্রীবের মন্ত্রী ও ইঞ্জিনিয়ার নল মাত্র পাঁচদিনে সমুদ্রে সেতু বাঁধলেন। হনুমানের পিঠে চড়ে রাম, বালীপুত্র অঙ্গদের পিঠে চড়ে লক্ষ্মণ সেতু পার হলেন। প্রথমে রাবণের কাছে সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে গেল অঙ্গদ। সীতাকে ফিরিয়ে দিলে যুদ্ধ

হবে না। রাবণ সন্ধির প্রস্তাব প্রত্যাখান করায় শুরু হল যুদ্ধ।

যুদ্ধের প্রথমদিনেই মেঘের আড়াল থেকে ইন্দ্রজিৎ নাগপাশে রাম লক্ষ্মণকে আঘাত করলেন। রাম লক্ষ্মণ চেতনা হারালেন। বানরদের মধ্যে হাহাকার পড়ে গেল। বিভীষণ তাদের মনোবল ফেরালেন। গরুড়-এর সাহায্যে রাম লক্ষ্মণ সুস্থ হলেন, তাঁদের ক্ষত সেরে গেল। যুদ্ধে একের পর এক রাক্ষস বীরেরা রাম লক্ষ্মণের হাতে মারা যেতে রাবণ স্বয়ং যুদ্ধে এলেন। রাম লক্ষ্মণের ক্ষমতা দেখে বিস্মিত হলেন।

পরের দিন অসময়ে কুম্ভকর্ণের ঘুমভাঙিয়ে যুদ্ধে পাঠানো হল। কুম্ভকর্ণ যুদ্ধ ক্ষেত্রে এসে টপাটপ বানরসেনাদের গিলে খেতে শুরু করলেন। রাম কুম্ভকর্ণকে বধ করলেন।

কুম্ভকর্ণের মৃত্যুতে বিচলিত রাবণ পুত্র-ইন্দ্রজিৎ-কে আবার যুদ্ধে পাঠালেন। ইন্দ্রজিতের ব্রহ্মাস্ত্রে রাম, লক্ষ্মণ সহ বানরসেনারা জ্ঞান হারান। জাম্বুবানের নির্দেশে হনুমাণ বিশল্যকরণী পর্বত উপড়ে আনেন। দিব্যঔষধ প্রয়োগে রাম লক্ষ্মণ ও বানর সেনারা বেঁচে যান।

ইন্দ্রজিৎ যখনই যুদ্ধে আসেন মেঘের আড়াল থেকে যুদ্ধ করেন। মায়াবলে অদৃশ্য হয়ে যান। প্রায়ই রাম লক্ষ্মণ ও বানরসেনারা রক্তাক্ত হন। লক্ষ্মণ রামকে ব্রহ্মাস্ত্র ছুঁড়তে বলেন। রাম রাজী হন না। কারণ ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ মানেই পরমাণু অস্ত্র প্রয়োগ। তাতে শুধু ইন্দ্রজিৎ মরবেন না, নিরপরাধ রাক্ষসদেরও মৃত্যু হবে!

ইন্দ্রজিৎ রাম লক্ষ্মণের সামনে মায়াসীতা বধ করেন। রাম শোকে প্রাণ ত্যাগ করবেন স্থির করেন। কিন্তু বিভীষণ রামকে আশ্বাস দেন ইন্দ্রজিৎ সীতাকে না, তাঁদের বিভ্রান্ত করার জন্য মায়াসীতাকে বধ করেছেন। বিভীষণের পরমর্শেই, ইন্দ্রজিৎ নিকুম্ভিলা যজ্ঞ শুরু করার আগেই তাঁকে বধের জন্য, গোপনে বিভীষণ ও লক্ষ্মণ লঙ্কা যাত্রা করেন, এবং লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিৎকে বধ করেন। প্রিয়পুত্র ইন্দ্রজিতের মৃত্যুতে রাবণ ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠেন। রাম ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগে রাবণকে বধ করেন। রামের নির্দেশে বিভীষণ হন লঙ্কার রাজা। এরপর রাম হনুমানকে নির্দেশ দেন অশোকবন থেকে সীতাকে আনার জন্য। একথা জানিয়ে দেন সীতা যেন স্নান করে শুচিবস্ত্র পরে রাজেন্দ্রাণীর মতো সভাকক্ষে আসেন। রামায়ণ পাঠে বারবার আমরা দেখি রামের প্রতি সীতার যে একনিষ্ঠ গভীর প্রেম, —রামের মধ্যে তা ছিল না। রাবণ বধের পর রামের তৎক্ষণাৎ সীতার কাছে যাওয়া উচিত ছিল। হনুমানের মুখে জয়ের সংবাদ পেয়ে বিহ্বলকাতর সীতা তখনই একবস্ত্রে রামের সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলেন। রাম কিন্তু প্রেমের উর্ধ্বে স্থান দিলেন ইক্ষ্বাকুবংশের রাজকীয় মর্যাদা। বনবাসী সীতাকে তিনি আসতে বললেন রানির বেশে। সীতা যখন রানির মতো সেজে শিবিকায় আসছিলেন তাঁকে দেখতে লঙ্কাবাসীদের ভিড় উপচে পড়ে। বিভীষণ ভিড় ঠেলে শিবিকার পথ করে দিচ্ছিলেন। এদৃশ্য দেখে রাম নির্দেশ দেন শিবিকা থেকে নেমে সীতা যেন পায়ে হেঁটে তাঁর কাছে আসেন! সীতা সামনে আসতে রাম যেসব অপমানজনক উক্তি করেন রামের মুখে তা শোভা পায় না। তিনি বলেন: যুদ্ধে শত্রু জয় করে তোমাকে মুক্ত করেছি। পৌরুষ দিয়ে যা করার তাই করেছি। শত্রুতার শেষসীমায় পৌঁছে, ধর্ষণ মাফ করে দিয়েছি। (এখানে প্রশ্ন ওঠে সীতা কী রাবণের হাতে ধর্ষিতা হয়েছিলেন?)। শত্রু ও অপমানকে বিনাশ করেছি। আমার পৌরুষ ও শ্রম সফল হয়েছে। প্রতিজ্ঞা থেকে উত্তীর্ণ হয়ে নিজের প্রভুত্ব ফিরে পেয়েছি (বোঝাই

যাচ্ছে রামেরও প্রভুত্বের আকাঙ্খা ছিল! আধিপত্যবাদ রাম মনে মনে লালন করতেন(!)। সীতার দুচোখ দিয়ে আনন্দাশ্রুর জল গড়িয়ে পড়ছে। হরিণীর মতো আনন্দিতা তিনি। আর এরকম আনন্দের মুহূর্তে রাম তাঁকে আঘাত দিলেন, অপমান করলেই এই বলে: তোমার ভালো হোক। তবে একথা মনে রেখো, বন্ধুদের সাহায্য নিয়ে, কঠোর পরিশ্রমে এই যে বীরের মতো যুদ্ধ জয়—তা তোমার জন্য না। আমার নিজের চরিত্র মর্যাদা ও বংশের কলঙ্ক মোছার জন্য। তোমার চরিত্র আজ সন্দেহজনক। তোমাকে দেখা আমার চোখের পক্ষে পীড়দায়ক। অতএব হে মৈথেলী, যেদিকে দুচোখ যায় চলে যেতে পারো, তোমাকে অনুমতি দিলাম! তোমাকে আমার আর কোন প্রয়োজন নেই! আমি সদ্বংশজাত, দীর্ঘদিন পরের গৃহে বাস করেছ তুমি, তোমাকে কীভাবে ফিরিয়ে নেব? রাবণের কোলে বসে তুমি পরিক্লিষ্ট, রাবণের লোভীচোখ তোমাকে দূষিত করেছে, তোমাকে গ্রহণ করে আমি কী বংশের গৌরব নষ্ট করব? (অদ্ভুত ব্যাপার, রাবণ সীতাকে হরণের আগে বিরাধ রাক্ষস রামলক্ষ্মণের সামনেই সীতাকে কোলে তুলে নিয়েছিল--তখন সীতাকে এসব কথা রাম বলেন নি। তাছাড়া রাবণ বলপূর্বক সীতাকে পুষ্পকরথে কোলে করে উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন—সেক্ষেত্রে সীতার দোষ কোথায়? রাম সম্বন্ধে তাঁর ভক্তেরা বলেন তিনি ন্যায় বিচারক। কিন্তু সীতার ক্ষেত্রে এরকম অপমানজনক উক্তিতে ন্যায় বিচার কোথায়? 'যে উদ্দেশ্যে যুদ্ধ জয় করেছি তা পেয়ে গেছি, তোমার প্রতি আমার কোন অভিলাষ নেই, তোমার যেখানে খুশি চলে যাও।' শুধু এই না, আরো সাংঘাতিক যে সব উক্তি করলেন, 'আমি তোমাকে বলছি, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন, সুগ্রীব বা বিভীষণ—এঁদের যাকে ইচ্ছে মনোনীত করে নাও! তোমার মতো সুন্দরী নারীকে রাবণ ভোগ না করে ছেড়ে দিয়েছে!' সীতাকে কুকুরে চাটা ঘি বলতেও ছাড়েননি! তাছাড়া বানররাজ সুগ্রীব ও রাক্ষসরাজ বিভীষণকেও যখন পতীত্বে বরণ করে নিতে বলছেন তখন স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে রামের কাছে সীতা ইতিমধ্যেই মৃত। আর এসব কথা রাম বলছেন সভাকক্ষে সবার সামনে! পরে দেবতারা যখন সীতাকে নিষ্পাপ ঘোষণা করলেন, রাম চালাকি করে বললেন, তিনি জানতেন সীতা নিষ্পাপ, লোক অপবাদের ভয়ে ঐসব কটূক্তি করেছিলেন। সীতা রামের কটূক্তির সমুচিত জবাব দিয়েছিলেন। রামের সঙ্গে তো তাঁর বনবাসে আসার কথা ছিল না। লক্ষ্মণের স্ত্রী উর্মিলা আসেনি। রামের প্রতি গভীর ভালোবাসার টানেই তিনি বনবাসজীবন বেছে নিয়েছিলেন। তাছাড়া রাম যদি বিষ্ণুর অবতার তাঁর তো জানার কথা রাবণ স্পর্শে সীতার সতীত্ব নষ্ট হয়নি। সীতাকে অগ্নিপরীক্ষা দিয়ে কেন প্রমাণ করতে হল তিনি শুদ্ধ ও পবিত্র আছেন? রামায়ণ পাঠে রাম ভক্তদের মনে এসব প্রশ্ন কেন জাগে না! লক্ষ্মণ চিতা নির্মাণ করলে সীতা চিতা তিনবার প্রদক্ষিণ করে বললেন: রামের থেকে আমার মন যখন সরে যায়নি তখন অগ্নি আমাকে রক্ষা করুন। আত্মশুদ্ধি প্রমাণের এই সত্যক্রিয়ায় সীতা উত্তীর্ণ হলেন। সীতার শুদ্ধি প্রমাণের পর বিভীষণ রামকে কিছুদিন লঙ্কায় থাকতে বললেও রাম রাজী হলেন না। বিভীষণের দেওয়া পুষ্পকরথে সীতাকে কোলে নিয়ে লক্ষ্মণ, সুগ্রীব ও বিভীষণের সঙ্গে অযোধ্যায় ফিরলেন। ফেরার পথে কিষ্কিন্ধ্যায় পুষ্পকরথ নামলো। বানর স্ত্রী পুত্র কন্যাদের পুষ্পকরথে তুলে নেওয়া হল। বোঝাই যাচ্ছে পুষ্পকরথ আধুনিক জাম্বোজেট প্লেনের মতো ছিল।

পুষ্পকরথ প্রথমে ভরদ্বাজ আশ্রমে অবতরণ করল। রাম হনুমানকে নির্দেশ দেন গুহককে সবকিছু জানিয়ে ভরতকে তাঁদের বনবাস থেকে ফেরার সংবাদ দিতে। হনুমান নন্দীগ্রামে গিয়ে ভরতকে সব বলেন কিন্তু সীতার অগ্নিপরীক্ষার কথা চেপে যান। এরপর রাম সবাইকে নিয়ে নন্দীগ্রাম আসেন। তারপর সবাইকে নিয়ে দিব্যরথে চড়ে অযোধ্যায় উপস্থিত হন। রামের রাজ্যাভিষেক সম্পন্ন হয়। রাম রাজকার্যে মন দেন। একবছর তাঁদের জীবন সুখেশান্তিতে সুন্দরভাবে কেটে যায়। সীতা সন্তানসম্ভাবা হন। রাম তাঁর সাধ পূরণ করতে চাইলে সীতা বাল্মিকীর আশ্রমে যেতে চান। কিন্তু প্রজারা সীতার সঙ্গে রাবণের সম্পর্ক জড়িয়ে নানারকমে আলোচনা শুরু করলেন। প্রজাদের কথা রামের কানে এল। রাম প্রজাদের অপবাদের ভয়ে বাল্মিকীর আশ্রমে সীতাকে নির্বাসন দিলেন। ন্যায়পরায়ণ রাজা হিশেবে সীতার প্রতি এ তাঁর অন্যায়। কারণ অগ্নিপরীক্ষা উত্তীর্ণ হওয়ার পরেই সীতাকে তিনি গ্রহণ করেছিলেন। প্রজাদের সেকথা জানিয়ে দিলে প্রজারা নিশ্চয় সত্যবাদী রামকে সন্দেহ করতেন না। নিজের জ্ঞাতসারে মিথ্যা কথা বলে রাম যখন সীতাকে ত্যাগ করলেন, সীতা গভীরভাবে দুঃখ পেলেন। নির্দোষ, অন্তঃসত্বা সীতা বাল্মিকী আশ্রমে বনবাসে গেলেন।

এ ঘটনার কিছুদিন পরে রাম আরেকটি গর্হিত কাজ করেন। এক ব্রাহ্মণের বালকপুত্র অসময়ে মারা গেলে প্রজারা বললেন নিশ্চয়ই রাজ্যে কারো পাপে এরকম-ঘটল। খোঁজ নিয়ে জানা গেল শম্বুক নামে একশূদ্র দেবত্ব পাওয়ায় জন্য তপস্যা করছে। রাম শম্বুকের কাছে গিয়ে তাঁকে যখন দেবত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন—শম্বুক স্বীকার করলেন তিনি তপস্যায় দেবত্ব পেতে চান। রাম সঙ্গে সঙ্গে কোষ থেকে খড়্গ বের করে শম্বুকের শিরোচ্ছেদ করলেন! এর থেকে বোঝাই যাচ্ছে রামরাজত্বে উচ্চবর্গের প্রজারা সুখে থাকলেও নিম্নবর্গের প্রজাদের প্রাণের কোন মূল্য ছিল না। অকালমৃত ব্রাহ্মণপুত্রের প্রাণ বাঁচাতে রাম শম্বুর প্রাণ নিলেন। অথচ সমাজে তাঁরাই ছিলেন সংখ্যা গরিষ্ঠ। শম্বুক সশরীরে স্বর্গে যেতে না পারায় দেবতারা রামকে সাধুবাদ দিতে পারেন—কিন্তু রামরাজত্বে নিম্নবর্গের মানুষেরা সমাজের নিচুতলায় যাঁরা বাস করতে বাধ্য হতেন তাঁরা রামকে ভাল বলবে না। রামরাজত্বে তাঁদের কোন সামাজিক-- আইডেনটিটি ছিল না। রামরাজত্বে নিম্নবর্গের মানুষ কখনোই সুখে ছিলেন না।

সীতাকে নির্বাসনে পাঠিয়ে রাম অশ্বমেধ যজ্ঞ করবেন স্থির করলেন। গোমতী নদী তীরে নৈমিষা অরণ্যে একবছর ধরে মহাসমারোহে অশ্বমেধ যজ্ঞ চলল। সীতার বদলে সীতার সোনারমূর্তি গড়িয়ে যজ্ঞ শেষ হল। বাল্মিকীর আশ্রমে সীতার যমজপুত্র লব কুশ জন্ম নিয়েছিল। অশ্বমেধ যজ্ঞের সময় তারা কিশোর। বাল্মিকী লব ও কুশকে নিজের রচনা রামায়ণের গান গাইতে শিখিয়েছেন। বাল্মিকীর নির্দেশে যজ্ঞের সময় ব্রহ্মচারীর বেশে সমবেত জনতাকে দুভাই রামকাহিনী শোনাচ্ছিলেন। সবাই মুগ্ধ লব ও কুশের গান শুনে। রাম তাদের ডেকে পাঠিয়ে পরিচয় জিগ্যাসা করাতে, বাল্মিকী লব ও কুশের পরিচয় দিলেন। রাম তখন বাল্মিকীদের বললেন—সীতা যদি রাজসভায় এসে নিজের শুচিতা প্রমাণ করেন, সীতাকে তিনি ফিরিয়ে নেবেন। বাল্মিকী রামকে বলেন, মৈথিলী যদি অশুচি হন আমি যেন আমার সারাজীবনের তপস্যার ফল না ভোগ করতে পারি। বাল্মিকীর এ ঘোষণার পর রামের সীতাকে গ্রহণ করা উচিত ছিল। তিনি তা করলেন না। না করে বাল্মিকীকেই অপমান করলেন।

এরপর রাম আরো বারো বছর রাজত্ব করেন। বারো বছর বয়সে বিশ্বামিত্র মুনির সঙ্গে তাড়কাবধে বেরিয়েছিলেন। তেরো বছরে সীতাকে বিয়ে করেন। অযোধ্যায় বারো বছর কাটানোর পর বনবাসে কাটে চোদ্দ বছর। উনচল্লিশ বছর বয়সে সিংহাসনে আরোহনে করেন। এরপর ত্রিশ বছর একমাস দশদিন রাজত্ব করে উনসত্তর বছর একমাস জীবিত থাকার পর রাম সরযূনদীর জলে নেমে চিরতরে বিলীন হয়ে যান।

আদিবাসী রামায়ণে রাম

এক মহান রাজা ছিলেন—নাম রাবণ। সসাগরা পৃথিবী তিনি শাসন করতেন। তাঁর ইচ্ছের ওপর সমস্ত মানব প্রজাতি, পশু-পাখি ও জিনিসের জীবন নির্ভর করত। রাবণ খুব নিষ্ঠুর রাজা ছিলেন। স্বেচ্ছাচারী ছিলেন। গরিব মানুষদের শোষণ করে অমানুষে রূপান্তরিত করতেন। অমানবিক জীবন কাটাতে তারা বাধ্য হত। আদিবাসী জনগণ সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাল রাবণকে বধ করতে—যাতে তারা দুঃখ-কষ্টের হাত থেকে মুক্তি পায়। আদিবাসী জনগণের প্রার্থনায় বিচলিত হয়ে ঈশ্বর রাম রূপে মর্ত্যে এলেন।

দশরথের ঘরে এক ভোপার ম্যাজিকে রাম জন্ম গ্রহণ করলেন। দশরথের কোন সন্তান ছিল না। ভোপার ম্যাজিকের ফলেই অসম্ভব সম্ভব হল। তাছাড়া রামকে রাবণ বধের জন্য যেহেতু মর্ত্যে আসতেই হবে—ম্যাজিকে কাজ হল। যথাসময় দশরথের তিনরানি চারপুত্রের জন্ম দিলেন। যেহেতু ভোপার যাদুতে চারপুত্রের জন্ম হল, ভোপা দুছেলেকে নিজের প্রয়োজন নিয়ে যেতে চাইলেন। যেহেতু পুত্র জন্মের শর্ত ছিল দু'ছেলেকে ভোপার কাছে দিয়ে দিতে হবে, রাজা দশরথ ছোট দু'ছেলেকে ভোপার সঙ্গে দিলেন। কিন্তু আদিবাসী রামায়ণের দশরথ মিথ্যেবাদী ও প্রতারক—ভোপা প্রতারণা বুঝতে পারলেন এবং প্রথম দু'পুত্র রাম ও লক্ষণকে অরণ্যে নিয়ে চলে গেলেন।

আদিবাসী ঐতিহ্য অনুযায়ী সীতার জন্ম হল। আদিবাসীদের সংস্কার ছিল রাজা নিজ হাতে জমি চাষ করলে অনাবৃষ্টির দেশে বৃষ্টি হবে। খরার হাত থেকে আদিবাসীরা বাঁচবে। আদিবাসীদের কথায় রাজা জমি চাষ করতে রাজী হলেন। এই জমি চাষ করার সময় লাঙ্গলের ফলায় উঠে এলো সীতা। রাজা জনকের কন্যা সীতা এভাবে জন্ম নিল। আদিবাসী রামায়ণের সীতা জন্মের ব্যাখা হল: খরার শিকার আদিবাসীরা তাদের জীবন্ত মেয়েকে মাঠে ফেলে দিত, খরার প্রকোপে তাদের এমনিতেই মৃত্যু হবে বলে। সীতা এরকমই এক পরিত্যক্তা কন্যা। চাষের জমিতে তাই পাওয়া গিয়েছিল।

রামের সঙ্গে সীতার বিয়েও আদিবাসী ঐতিহ্য অনুযায়ী হয়েছিল। আদিবাসী রাজা জনক কোন রাজপ্রাসাদে বাস করতেন না। এক সাধারণ পর্ণ-কুটিরে তিনি বাস করতেন। আদিবাসীদের প্রিয় তির ধনু জনকের পর্ণকুটিরে সামনের উঠোনে ছিল। এই ধনু এত ভারী ছিল যে, কারো পক্ষে ধনুটি তোলা সম্ভব ছিল না। সীতা কিন্তু উঠোনে গোবর ছঁচ দেওয়ার সময় ধনুটি তুলেছিলেন। আর তা দেখে জনক প্রতিজ্ঞা করেছিলেন—যিনি ঐ ধনুটি তুলে ভেঙে দুটুকরো করতে পারবেন, তাঁর হাতেই কন্যাকে সম্প্রদান করবেন। রাম হরধনু তুলে ভাঙতে পেরেছিলেন—তাই জনক রামের সঙ্গে সীতার বিয়ে দেন।

আদিবাসী রামায়ণে কৈকেয়ীর ঈর্ষার জন্য রামের বনবাস হয়নি, দশরথের দুর্ব্যবহারের জন্য হয়েছিল। একদিন সকালে স্বৈরাচারি রাজা দশরথ নিজে নগর দুর্গের গেটে লিখিত ঘোষণা করেন, যে ভরত ও শত্রুঘ্ন তাঁর রাজ্য পরিচালনা করবে আর রাম-লক্ষণ বনবাসে যাবে। আদিবাসী রামায়ণ অনুযায়ী রাজা দশরথই রাম-লক্ষ্মণকে বনবাসে পাঠানোর জন্য দায়ী। আদিবাসীরা রাজাকে সবসময়েই নিষ্ঠুর হিশেবে গণ্য করে।

বনবাসে থাকার সময় রাম-লক্ষ্মণ সোনার হরিণের মাংসের লোভেই তাকে তাড়া করেন। এ কোন মায়াবী হরিণ ছিল না বা প্রকৃত অর্থেই সোনার হরিণ- যা দেখে তাঁরা মুগ্ধ হতে পারেন। হরিণ বধ করে হরিণ মাংস আহার করাটাই ছিল রাম-লক্ষ্মণের কাছে প্রয়োজনীয়। কারণ প্রায় বুনো ফলমূল সংগ্রহের জন্য রাম-লক্ষ্মণকে গভীর অরণ্যে যেতে হত। সোনালী হরিণকে পর্ণকুটিরে সামনে চরতে দেখেই দুভাইকে বলেন—হরিণটা মারলে তো মাংস ওর খাওয়া যায়। সীতার সোনালী হরিণ মারার ইচ্ছে আদিবাসী রামায়ণে নতুন অর্থের দ্যোতক।

আদিবাসী রামায়ণের সীতা হরণ যেভাবে বর্ণনা করা আছে মূল রামায়ণে সেরকম নেই। রাবণ যাতে সীতাকে হরণ করতে না পারে তাই সীতাকে বলা হয়েছিল যে কেউ ভিক্ষে করতে এলে সীতা একবারে সব ক্ষুদ না দিয়ে যেন একটু একটু করে দিয়ে কাল হরণ করতে থাকে কিন্তু সীতা ভুল করে রাবণকে একবারেই মুঠোভর্তি ক্ষুদ দিয়েছিলেন—যার ফলে সীতাকে রাবণের হরণ করতে সুবিধে হল। আদিবাসী প্রথা ভাঙার ফলেই সীতার জীবনে দুর্গতি নেমে এল।

রামায়ণের রাম চরিত্রের পুরাণকথার স্থান ভারতের বিভিন্ন আদিবাসী অঞ্চলে দেখতে পাওয়া যায়। যেমন: পশ্চিম উড়িষ্যায় গন্ধমাদন পাহাড় আছে, কোরাপুট ও বস্তারের কাছে চিত্রকূট জঙ্গল আছে, মাল্যবন্তগিরি উড়িষ্যার কোরাপুট জেলার মালকান গিরি ও ছত্রিশগড়ের তুরতুরিয় রামায়ণের পুরাণকথা স্থান। এইসব জায়গায় রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার পদচিহ্ন পড়েছে। রাম, লক্ষ্মণ ও সীতাকে নিয়ে দন্ডকারণ্যে প্রবেশ করেছিলেন। সীতা সবরী নদীতে স্নান করেছিলেন, এখন যা কোরাপুটের কোলাব নদী হিশেবে পরিচিত। পাহাড়ের ওপর রাম একটি শিবলিঙ্গের পুজো করেছিলেন—যা থেকে পাহাড়টির নাম হয়েছে রামগিরি। কালাহান্ডি জেলার কাটপার—পুরুবাড়ি পাহাড়ি অঞ্চলে পাতালগঙ্গা নামে একটি পবিত্র স্থান আছে। এ স্থানের পুরাণকথা হল: সীতার তৃষ্ণা নিবারণের জন্য লক্ষ্মণ তির ছুঁড়ে পাতালভূমি ভেদ করে জল বের করে এনেছিলেন। এটি একটি প্রাকৃতিক ফোয়ারা। এখানে একটি পাথরের রাম-সীতার পদযুগল পুজো করা হয়। দক্ষিণ কোশলার রাজধানী হিশেবে পরিচিত কুশবতী নগর বোলাংগীর জেলার রণিপুর—ঝুরিয়া অঞ্চল পুরাতাত্ত্বিক স্থান হিশেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। কাছেই কাহাসিল নামে একটা গ্রাম আছে। ঐতিহাসিকরা মনে করেন গ্রামটির নাম কুশথালি বা কুশবতী থেকে এসেছে। মন্দির স্থাপত্য দক্ষিণ কোশালার সোমাবমসি রাজার কীর্তি বলে মনে করা হয়। তুরতুরিয়া ছত্রিশগড়ে। যেখানে ঋষি বাল্মিকীর পর্ণকুটির ছিল। যেখানে সীতা, লব ও কুশের জন্ম দিয়েছিলেন।

প্রায়ই দেখা যায় লোকেরা তাদের স্থানীয় দেবতাদের নামের সঙ্গে রামের নাম যুক্ত

করেন। গরহামানডালার গোন্ড উপজাতির পুরাণেও রামের দেখা পাওয়া যায়। গোন্ড উপজাতির সৃষ্টির পুরাণে দেখা যায় মহাদেব ও পার্বতীর মিলনে প্রথমে যে মানব জন্ম নেন তিনি রাম। রাম-রাবণের যুদ্ধের সময় রাবণের রাজ্যসীমার জঙ্গলে এক গোন্ড দম্পত্তি ছিলেন। পূর্বজন্মে মহাদেব তাদের অভিশাপ দেন লঙ্কায় রামের আর্বিভাব ঘটলে রামের পা ধোয়া জল না খাওয়া পর্যন্ত তাদের কোন ছেলেপুলে হবে না। গোন্ড দম্পত্তি রামের জন্য জঙ্গলে অপেক্ষা করছিলেন, রামের দেখা পেয়ে রামের পুজো দিয়ে তাঁরা রামের পা জলে ধুয়ে দিয়ে, সেই জল পান করলেন। রাম তাদের আর্শীবাদ করে বললেন তোমরা রাবণবংশী গোন্ড বলে পরিচিত হবে। তোমাদের তিনপুত্র হবে—আলকো, তলকো ও কারচো। তারপর রাম রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাঁকে হত্যা করলেন। লঙ্কা থেকে সীতাকে নিয়ে ফেরার পথে রাম গোন্ড উপজাতিকে নিজের সঙ্গে নিলেন। তারা সূর্যবংশী গোন্ড হিশেবে পরিচিত লাভ করল এবং তাদের সঙ্গে রাবণবংশী গোন্ডদের সঙ্গে সূর্যবংশী গোন্ডদের আত্মীয়তা হল।

মালকানগিরির বোন্ড উপজাতির যে মিথ রামকথায় সঙ্গে জড়িত তা হল: যখন রাম সীতা ও লক্ষ্মণকে সঙ্গে নিয়ে বনে বনে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, বোন্ড মেয়েরা তাদের দেখে হেসে ওঠে দুটো কারণে—প্রথম কারণ হল দুজন পুরুষ একটি মেয়েকে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর দ্বিতীয় কারণ মেয়েটি এমন পাতলা পোশাক পরেছে যে, তার দেহের সবকিছু স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। সীতাকে ব্রহ্মা পোশাকটা দিয়েছিলেন। সীতা বোন্ড মেয়েদের হাসির কারণ বুঝতে পেরে যান, ফলে তাদের অভিশাপ দেন: আজ থেকে বোন্ড মেয়েরা অর্ধনগ্ন থাকবে। বোন্ড গ্রাম থেকে বোন্ডদের এই মিথ ভেরিয়ের এল্যুইন সংগ্রহ করেন এবং বোন্ড মেয়েরা কেন অর্ধনগ্ন থাকে তার ব্যাখা হিশেবে রাম, লক্ষ্মণ, সীতার এই কাহিনীটি বলেন। এইসব মিথের সাহায্যে আদিবাসীরা বলতে চান তাদের পূর্বপুরুষদের সমসাময়িক রাম। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে থাকা আদিবাসীরা এভাবেই রামকথার সঙ্গে জড়িত। ভারতের বিভিন্ন জাতি, ও উপজাতি বিশেষত শাসন ক্ষমতায় থাকা রাজারা রামায়ণ পুরাণ থেকে কিছু অংশ তাদের নিজেদের বলে গ্রহণ করেছেন। যেমন সীতার নির্বাসন, লব ও কুশকে নিজের পুত্র হিশেবে রামের গ্রহণ।

লোকলজ্জার ভয়ে রাম সীতাকে নির্বাসন দেন।

সীতাকে যখন নির্বাসন দেওয়া হয়—সীতা গর্ভবতী, পরিত্যক্তা, বিচ্ছিন্ন ও অসহায় এবং তাকে বাস করতে হচ্ছে বনে।

পরিত্যক্তা সীতাকে ঋষি বাল্মিকী দেখতে পান এবং আশ্রমে নিজের মেয়ের মত সীতাকে পালন করতে থাকেন।

লব ও কুশ বাল্মিকীর আশ্রমে জন্মগ্রহণ করেন এবং তাদের প্রতিপালন ও শিক্ষিত করে তোলেন বাল্মিকী।

অসাধারণ, অতিমানবিক ক্ষমতা প্রদর্শন করার পর রাম লব ও কুশকে প্রতিপালনের দায়িত্ব নেন।

রাম উত্তর কোশলা ও দক্ষিণ কোশলা যথাক্রমে লব ও কুশকে দেন।

কালাহান্ডি গাউর (গোয়ালা) জাতের লোকমহাকাব্যে রামকথা আছে। এগুলি বাঁশ-সংগীত নামে পরিচিত। এই বাঁশ-সংগীত পরিবেশনের সময় বাঁশেরবাঁশি বাজানো হয়। এই গান একনাগাড়ে দুরাত্রি ধরে গাওয়া হয়। এই মহাকাব্যিক সংগীত পশ্চিম উড়িষ্যার গাউর সম্প্রদায়ের নৃতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতিনিধিত্ব করে। ছত্তিশগড়ে এই বাঁশ গীতের জনপ্রিয়তা আছে। যদিও পশ্চিম উড়িষ্যার চেয়ে ছত্রিশগড়ের বাঁশগীতের ভাষা আলাদা। কিন্তু বিষয় ও ফর্ম—প্রায় একই। মহাকাব্যটির নাম কোত্রাবায়না—রামেলা। মহাকাব্যের নায়ক কোত্রাবায়না, নায়িকা রামেলা।

কোত্রাবায়না গল্প এই রকম: একজন গ্রামের চাষি। তার কাজ ভেড়া আর গরু চরানো, দুধ ও দই বিক্রি করা। তার বউ রামেলা দারুণ সুন্দরী, তার ছ-মাসের একটি শিশু ছিল। দেশের রাজা একজন সুন্দরী মেয়ে খুঁজছিলেন। কোত্রাবায়না স্ত্রীকে বেনদুল শহরে দুধ ও দই বিক্রি করতে যেতে বারণ করলেন। কারণ, তার ভয় ছিল রাজা যদি সুন্দরী রামেলার কথা জানতে পারেন তাহলে তাকে হরণ করবেন। একদিন যখন কোত্রেবায়না তার বোনের বাড়ি গেছে, বেনদুল শহরে যাওয়ার আগ্রহ রামেলা দমন করতে পারল না। দুধ ও দই নিয়ে সে শহরে গেল, শিশুপুত্রটিকে ননদের কাছে রেখে। রাজার সৈন্যরা রামেলাকে দেখতে পেল এবং তারপরেই রামেলাকে রাজা বলপূর্বক রাজপ্রাসাদে ধরে নিয়ে গেল।

বোনের বাড়িতে কোত্রেবায়না যখন ঘুমে আচ্ছন্ন, তার গৃহদেবতা স্বপ্নে রামেলার অপহরণ তাঁকে দেখালেন। কোত্রেবায়না দ্রুত ঘরে ফিরে এলেন, দেখলেন স্বপ্নে যা দেখছেন তাই সত্যি। সে তার বারো লক্ষ গরু ও বারো লক্ষ ভেড়াকে জড়ো করল। এদের সঙ্গে মন্ত্র:পূত একটি বলদ ও একটি ভেড়া ছিল--যাদের নাম কুরমেল সন্ধ ও উলতিয়া গাদরা। কোত্রেবায়না বেনদুল শহর আক্রমণ করলেন রাজার হাত থেকে রামেলাকে মুক্ত করতে। বলদ ও ভেড়ারা গোটা শহর ধ্বংস করল। কোত্রেবায়না রাজাকে হত্যা করে রামেলাকে উদ্ধার করল। যেহেতু দুঃশ্চরিত্র রাজা রামেলাকে অপহরণ করেছিলেন গাউর সমাজ রামেলারে সতীত্ব নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করল। নিজের সতীত্ব প্রমাণ করার জন্য চিতা সাজিয়ে রামেলা তার মধ্যে প্রবেশ করল। আগুন তাকে স্পর্শ করলনা। রামেলার সতীত্ব প্রমাণিত হল। কিন্তু সমাজের বাস্তুঘুঘুরা চাইল রামেলা আবার তার সতীত্ব প্রমাণ করুক।এবার শর্ত দেওয়া হল—রামেলা চিতায় প্রবেশ করার পর যদি তার ছ-মাসের শিশু হামা গুড়ি দিয়ে চিতায় প্রবেশ করে বুকের দুধ খায় তাহলে তাকে সতী বলে গ্রহণ করায় সমাজের আর কোন আপত্তি থাকবে না। রামেলা এ পরীক্ষাতেও উত্তীর্ণ হল এবং গাউর সমাজ সতী বলে তাকে গ্রহণ করল। এক্ষেত্রে মূল রামায়ণের সীতার মত রামেলার পাতাল প্রবেশ ঘটল না। এখানে রামায়ণের অংশবিশেষ—বিশেষত রাম—সীতা—রাবণকে নিয়ে বাঁশগীত-এর লোকায়ত উপাদানে সমৃদ্ধ হয়েছে।

রাম--কোত্রেবায়না

সীতা--রামেলা

রাবণ---বেন্দুলের রাজা

হনুমান---কুরমেল সন্ধ

জাম্বুবান—উলতিয়া গাদরা

লোকগাথা বাঁশগীত-এর কাহিনী থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে রামায়ণের অংশবিশেষ বাঁশগীত-এ ঢুকে গেছে। এখানে লক্ষ্মণ নেই, কিন্তু কোত্রেবায়ানা রামেলাকে বেন্দুল শহরে যেতে নিষেধ করে—এই নিষেধ লক্ষ্মণ রেখা। লক্ষ্মণের অনুপস্থিতির সুযোগে রাবণ সীতাকে হরণ করেছিলেন—এখানে কোত্রেবায়ানার অনুপস্থিতির সুযোগে বেন্দুলের রাজা রামেলাকে অপহরণ করে। রাম লঙ্কা ধ্বংস করেছিলেন বানর ও ভালুকদের সাহায্যে—এখানে কোত্রেবায়না বলদ ও ভেড়ার সাহায্যে বেন্দুল শহর ধ্বংস করে রামেলাকে উদ্ধার করেন। কুরমেল সন্ধ ও উলতিয়া গাদরা এক্ষেত্রে হনুমান ও জম্বুবান। সীতাকে একবার অগ্নিপরীক্ষা দিতে হয়েছিল, পরে প্রজাদের সন্দেহ ভাঙার জন্য রাম যখন সীতাকে দ্বিতীয়বার অগ্নিপরীক্ষা দিতে বলেন সীতা পাতালে প্রবেশ করেন। একইভাবে রামেলাকে দুবার অগ্নিপরীক্ষা দিয়ে তার সতীত্ব প্রমাণ করতে হয়েছে।

গুজরাটের আদিম অধিবাসী দুবলাসরা সুরাট জেলার বাসিন্দা। প্রধানত ক্ষেতে দিনমজুরের কাজ করে। শীতকালে হিন্দুদের দীপাবলী উৎসবের আগে বা পরে এঁরা বর্ণিল পোশাক ও পরিচ্ছদে নাচের দল তৈরি করেন—যাকে বলা হয় ঘের। বহুবর্ণের পোশাক ও পালক দিয়ে নিজেদের সাজান। নানারকম অলঙ্কার পরেন। বাঁহাতে ময়ূর পালক ও ডানহাতে ছোট ছোট কাঠি নিয়ে গ্রামের পর গ্রাম-বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়ান কাঠিতে কাঠি ঠেকিয়ে গান গেয়ে গেয়ে নাচতে নাচতে। এইসব গানের মধ্যে একধরনের গানকে বলা হয় পাভেদা। পাভেদা--তে দুবলাসরা রামের গান গেয়ে থাকেন। নিজেদের সাংস্কৃতিক আইডেনটিটি অনুযায়ী তাঁরা রাম ও সীতার বিয়ের গান গায়। এখানে অযোধ্যার রাজা দশরথ রায়। তাঁর স্ত্রী পুত্র শ্রী রঘুপতি। সীতার বয়েস সাত, রামের নয়। সাতবছরের রাম শ্লেট ও কালির দোয়াত নিয়ে বিদ্যালয়ে যাচ্ছে। যখন তিনি পড়াশুনার পাঠ চুকোলেন, বিয়ের প্রস্তাব এলো। সীতার সঙ্গে রামের বিয়ে ঠিক হয়ে গেল এবং তাঁরা সবাই বনে কাঠ কুড়োতে গেলেন। বলদগাড়িতে বিয়ের শোভাযাত্রা চলল। অবাধপুরে রাম সীতা বিয়ে হবে। লগ্ন প্রায় উপস্থিত। এমন সময়ে জ্যোতিষি হাত দেখে বলল সীতাকে কেউ হরণ করবে। প্রথমে রাম সীতা বিয়ের শপথ বাক্য উচ্চারণ করলেন,তারপর ড্রাম বেজে উঠল, বিয়ে হল, রামের হাতে সীতাকে সমপর্ণ করা হল। ইতিমধ্যে আরেকজন বিখ্যাত জ্যোতিষি এলেন। রাম ও সীতার ঠিকুজি-কোষ্ঠি দেখলেন এবং সুনিশ্চিতভাবে ভবিষ্যদবাণী করলেন সীতাকে কেউ হরণ করবে।

অন্য একটি পাভাদোতে সোনার হরিণের গল্প। লক্ষ্মণ গর্ত খোঁড়ার পর সীতা সেখানে একটি ডুমুরগাছ লাগিয়ে জল দেন। প্রতিদিন জল দেন কিন্তু একটা হরিণ জল খেয়ে পালায়। সীতা রামকে অনুরোধ জানান হরিণটিকে শিকার করার জন্য। হরিণ শিকার করে ফিরে এসে রাম লক্ষ্মণ দেখেন সীতা নেই। পর্ণকুটির শূন্য, বাগানশূন্য, শূন্য কুটিরের মাথায় উড়ছে কাক। রাম কুটিরের সামনে বসে চোখের জল ফেলছেন। শূন্যচোখে তাকিয়ে আছেন সীতার চলে যাওয়া পথের দিকে তাকিয়ে। সীতাকে খুঁজতে হনুমান লঙ্কায় গেলেন। সীতাকে সন্ধান করার পর সোনার লঙ্কায় আগুন ধরিয়ে দিলেন। আগুনজ্বলা লেজ দিয়ে নিজের মুখ মোছার জন্যই হনুমানের মুখ কালো। সেই হনুমানদের মুখ আগুনে পোড়ার মতো কালো।

মধ্যপ্রদেশের ভানোয়াদের রামকথা অন্যরকম। প্রাচীনকালে তেঁতুলপাতা কলাপাতার

মতো বড়ো ছিল। রাম-লক্ষ্মণ বনবাসকালে, গরমদিনে খোলা আকাশের নিচে শুতেন। বৃষ্টির দিনে তাঁরা তেঁতুল গাছের নিচে আশ্রয় নিতেন। বর্ষাকালের যখন দিন-রাত বৃষ্টি হত গাছের পাতা থেকে জলের ঢল নামত, আর সেই জলের ধারায় সীতার উনুন নিভে যেত। তিনি রান্না করতে পারতেন না। রাম, লক্ষণ প্রচন্ড রেগে ইন্দ্রকে চিঠি লিখলেন: মেঘের রাজা ও রানি যখনই জন্ম নেবে গর্তে ফিরিয়ে নিন। চিঠিটা একটা তিরের ফলায় বেঁধে লক্ষ্মণ আকাশে পাঠিয়ে দিলেন। আকাশে যাওয়ার সময় লক্ষ্মণের তির তেঁতুল পাতাকে শতছিন্ন করল। সেই থেকে তেঁতুলপাতা ছোট হয়ে গেল। রামকথায় আদিবাসীরা রামচরিত্রে অনেক কাহিনী নিজেদের সমাজের প্রচলিত লোকবিশ্বাস অনুযায়ী আরোপ করেছেন।

উড়িষ্যার কালাহান্ডি জেলার কামাররা মনে করেন, রামের লঙ্কা আক্রমণের সময় হনুমান লঙ্কা নগরীতে আগুন ধরিয়ে দেয়। হনুমান আগুন ধরাচ্ছে দেখে দানব রাজা রাবণ চিৎকার করে ওঠেন: পৃথিবীর সমস্ত আগুন নিভে যাক! পৃথিবীর সমস্ত আগুন নিভে যাওয়ার ফলে রান্নার উনুন জ্বালানোর মতো আগুন রইল না। রাবণের বিরাট ক্ষমতা দেখে হনুমান ভয় পেলেন। হনুমান সমুদ্রতীরে গিয়ে নিরঙ্কর স্বামীকে বললেন: পৃথিবীতে যদি আগুন না থাকে রাম লজ্জা পাবেন। নিরঙ্কর হনুমানকে বললেন: কপাল ঘষো, তা থেকেই আগুন জন্ম নেবে। এত আগুন বেরোবে যে রাবণের বাবাও তা নেভাতে পারবে না। হনুমান কপাল ঘষার ফলে যে আগুন বেরিয়ে এলো তা আজও মর্ত্যে রয়ে গেছে।

উড়িষ্যার কামারদের রামকথায় তোতাকাহিনী আছে। রাবণ যখন সীতাকে নিয়ে পালাচ্ছিলেন তখন রাম রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ করে রাবণকে ও রাক্ষসদের হত্যা করেন। রাবণের একজন রক্ষী কোনওক্রমে তখনো বেঁচে। রামের পায়ে পড়ে সে বলল: আমাকে ছাড়া আপনি সবাইকে মেরে ফেলেছেন। আমাকে বাঁচতে দিন আর আমার একজন বন্ধুকে বাঁচিয়ে দিন। রাম বললেন, ভালো কথা, আমি তোমাদের দুজনকেই ছেড়ে দিচ্ছি, শিগগির এখান থেকে পালাও, নতুবা লক্ষ্মণ এখানে আসছে, ও তোমাদের ছাড়বে না, হত্যা করবে! কিন্তু তারা বলল: আমরা দুর্বল, পালাতে পারবো না, লক্ষণ আমাদের ধরে ফেলবে এবং হত্যা করবে! রামের দয়া হল। রাম তাদের ডানা দিলেন। রক্ষী তোতাপাখি হল আর তার বন্ধু চিল। তারা আকাশে উড়ে পালিয়ে গেল। এজন্যেই তোতাপাখি দ্রুত 'রাম, রাম' বলা শেখে।

আদিবাসীরা মনে করেন রামায়ণের কোন না কোন চরিত্র থেকে তাঁদের বংশধারা প্রবাহিত। সাওরারা মনে করেন রামের পুজো করেছিলেন যে ভীলরমণী—সেই শবরীর বংশধর তাঁরা।

সাঁওতালরা গর্ব করে বলেন রামায়ণের বিরুদ্ধে তারা রামকে যুদ্ধে সাহায্যে করেছিলেন। তাদের শিকার খেলার অরণ্য অযোধ্যাপাহাড়ের কাছে। সাঁওতালি লোককথায় রাম-লক্ষ্মণ বড় বড় পশুশিকার শুধু করে না, রাক্ষসদের হত্যা করে।

রাজস্থান ও মধ্যপ্রদেশ নিমাড় অঞ্চলের রামকথায় সীতা কোন এক খরার বছরে জন্মগ্রহণ করে, যে কোন আদিবাসী শিশুর মত সীতা খরার শিকার। সোনার হরিণ মারা হয়েছিল মাংসের জন্য—যা আদিবাসীদের সুস্বাদু খাবার। আবার ছত্রিশগড় ও পশ্চিমউড়িষ্যার

বোন্ডা, বাইগা, গাইগা প্রভৃতি আদিবাসীদের রামকথা থেকে জানা যায় কোন খরার বছরে বৃষ্টি আনার জন্য ঋষ্যশৃঙ্গ যজ্ঞ করা হয়েছিল। রামকথার ঐতিহ্য এখানে স্থানীয় পরিস্থিতি অনুযায়ী বদলে নেওয়া হয়েছে। ছত্তিশগড়, পশ্চিম-উড়িষ্যা খরাপ্রবণ এলাকা।

বীরহোররা বিহারের শিকারী সম্প্রদায়। ভীলদের ভীলোড়ী-রামকথায় রামের চোদ্দ বছর বনবাসের উল্লেখ আছে। তারা মনে করেন রাম বীরহোরদের একজন ছিলেন। তাদেরই মত বনের জীবন কাটাতেন। রামই তাদের ফাঁদ পেতে শিকার ধরা শেখান এবং বানর মেরে খাওয়ার ব্যাপারে অনুমতি দেন।

অন্যদিকে মুন্ডারা তাদের নিজেদের মত করে রামকথা বদলে নিয়েছে। মুন্ডাদের কাছ থেকে রামকথা ছড়িয়ে পড়েছে অস্ট্রো-এশিয়াটিক ভাষাভাষী সম্প্রদায়ে। মুন্ডাদের রামকথা অনুযায়ী সীতাকে চষাখেতের ভেতর পাওয়া গেছে। সীতা একজন আদিবাসী বালিকা। ছাগল চরায়। রাবণ সীতাকে হরণ করে নিয়ে যায়।

মূল রামায়ণের কাহিনী থেকে অনেক তফাৎ আছে অবধী ও ভোজপুরী লোক সংগীতের রামকথার। এদের লোকয়ত ও আদিবাসী প্রথা অনুযায়ী সীতা কোন দেবকন্যা না, বরং সে বেশ সাহসী,বলিষ্ঠ ও আত্মমর্যাদা সম্পন্ন মহিলা--যে সীতা অযোধ্যা ফিরে যাওয়ার ব্যাপারে রামের অনুরোধে প্রত্যাখ্যান করেন। সীতার শোক ও দুর্ভাগ্যই প্রধান এইসব রামকথায়।

দক্ষিণ ভারতের তেলুগু, তামিল, মালায়লাম ও কন্নড় লোক-সাহিত্যের রামকথায় সীতা দেবী। রাবণ তাঁকে কখনোই স্পর্শ করতে পারেনি। রাম ঈশ্বরের প্রতিনিধি। রাম কখনো কোন ভুল করতে পারেন না। মহীরাবণের গল্পও বেশ চমৎকার! এইসব লোকায়ত রামকথায় সীতা সবসময় সতীর মর্যাদা পেয়েছেন। তামিল রামকথায় সীতা রাবণের ছবি আঁকছে। মিজো রামকথায় একই চিত্র আছে।

বাল্মিকীর রামায়ণ অনুসরণ করে আসামের লোক গীতিকার রামকথা বাঁধালেও--সে সব রামকথায় স্থানীয় রীতিনীতি, প্রথা ও বিশ্বাস স্বাভাবিকভাবে এসেছে। ঐতিহ্য এসব রামকথায় প্রাধান্য পেয়েছে।

মিজো রামকথায় লক্ষ্মণের প্রাধান্য বেশি। এদের রামকথায় রাবণের কখনো সাতটি কখনো বারোটি মুন্ডু। লক্ষ্মণ ও হনুমান মিজো রামকথায় বীরের মর্যাদা পেয়েছে।

ত্রিপুরাতে আদিবাসী ও লোকায়ত ঐতিহ্য অনুযায়ী নানা রকম রামকথা আছে। বৌদ্ধদের রামকথায় রামকে বোধিসত্ব বলা হয়েছে। যেখানে রাম সীতার কাছে ক্ষমা প্রার্থণা করছেন এবং শিশুপুত্র নিয়ে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তাঁরা সুখে ঘর সংসার করছেন। অন্য কোনও রামকথায় রাম-সীতার এত সুখী দাম্পত্য-জীবন পাওয়া যায় না।

প্রক্ষিপ্ত আদিকান্ড ও উত্তরকান্ড নিয়ে বাল্মিকী রচিত যে রামায়ণ—তার চরিত্রগুলির প্রভাব ভারতবাসী বা ভারতীয় উপমহাদেশর দৈনন্দিন সমাজ জীবনে এত গভীর যার তুলনা অন্য কোন দেশের মহাকাব্যে পাওয়া যায় না। রামায়ণের মতো প্রভাব ইউরোপের সমাজ জীবনে ইলিঅদ, ওদেসি বা নিবেলুংগেনে নেই। হিন্দুদের জীবনে রামের যে প্রভাব বাইবেলের কোন চরিত্রের প্রভাব সেভাবে কৃশ্চানদের মধ্যে নেই। ১২১ কোটি ভারতবাসীর এক বিরাট সংখ্যক পুরুষ ও নারীর নাম রামায়ণ থেকে এসেছে, রামের নাম অসংখ্য। রাম-

—রঘুপতি, রাম—রাঘব রাম নাম উত্তরভারতে ঘরে ঘরে উচ্চারিত হয়। রামের নাম ভারতীয় শিল্প—সাহিত্য—চিত্রকলা—চলচ্চিত্র, নাটক, সংস্কৃতির এক বিরাট অংশ জুড়ে রামকে প্রতিদিন বিনির্মাণ করে নিচ্ছে। ভারতীয় ধ্রুপদী ও লোকসংগীতেও রামের বিরাট প্রভাব। এছাড়া ভারতীয় মুখফেরতা সাহিত্যে রামকথা নানাভাবে আজো ভারতবাসীর সমাজ জীবনে প্রতিফলিত। ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায় রামায়ণের মিথ থেকে রামের আর্কিটাইপ যে যার মতো বিনির্মাণ করে নিয়েছেন। ভারতের আদিবাসী সমাজ জীবনেও নানা গাথা, লোকগীতি, যাত্রাপালার মাধ্যমে রামের বিনির্মাণ প্রতিদিন ঘটছে। এ.কে. রামনুজনের (A.K.Ramanujan) তিনশ রামায়ণ (Three Hundred Ramayanas) থেকে তিনশ রকমের রামকে পাওয়া যায়। যা বাল্মিকী রামায়ণের রামের ডিকনস্ট্রাকশন। পাউলা রিচম্যানের (Paula Richman) -এর Many Ramayanas-এ একহাজরের বেশি রামকথা পাওয়া যায়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই রাম-এর আচার আচরণ যতটা না দেবতার মতো তার চেয়ে বেশি মানুষের মতো। বিশেষত সীতা, বালী, গুহক ও শম্বুক—এর প্রতি রামের ব্যবহার সাম্প্রতিক সমাজের চোখে অপরাধ।

ভারতে প্রায় ২৫ মিলিয়ন আদিবাসী গোষ্ঠীর মানুষ আছেন। এঁরা গভীর অরণ্যে, পাহাড়ী উপত্যকায়, কখনও বা এমন জায়গায় বসবাসের জন্য বেছে নেন যেখানে কোন হাইওয়ে বা আধুনিকযুগের সড়ক প্রবেশ করেনি। সমতলের মানুষের থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতেই এঁরা ভালোবাসেন। মাঝে মাঝে কাজের সন্ধানে দলে দলে শহরে এলেও, সন্ধের আগেই শহর থেকে গ্রামে ফিরে যান। অথবা কোন সোনালি চতুর্ভুজ সড়ক বা হাইওয়ে তৈরির কাজে স্থানান্তরে গেলেও দলবেঁধে যান এবং পথের ধারেই ঝুপড়িতে ক্যাম্প করে থাকেন। এঁদের মধ্যে একটা বড় উপজাতি ভীল — যাঁরা মহারাষ্ট্র, অন্ধ্রপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থানে থাকেন। আরেকটি উপজাতি সাঁওতাল—এঁরা প্রধানত পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ঝাড়খণ্ড অরণ্য-অঞ্চলে থাকেন। নাগারা নাগাল্যান্ডে-এ থাকেন। গোন্ড উপজাতি মধ্যপ্রদেশে। চেঙ্গুস আর রাজগোন্ডরা অন্ধপ্রদেশে। সেনাদিগ-রা তামিলনাড়ুতে। দিন এনে দিন খাওয়া এইসব মানুষ বিশ্বায়নের পৃথিবীর মধ্যেই পাথরযুগে বাস করলেও তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি আছে। আদিম পদ্ধতিতে তাঁরা আজও চাষবাস করেন। পশুপাখি শিকার করেন। অরণ্যের ফলমূল খেয়ে বেঁচে থাকেন। এইসব আদিম উপজাতির সংস্কৃতির প্রধান বিষয় : নাচ, গান, মুখফেরতা সাহিত্য, ধর্মীয় নানা অনুষ্ঠান—যা তাঁদের গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনকে সংহত রাখতে সাহায্য করে। এঁদের মুখফেরতা সাহিত্য, নাচ-গানের একটি অন্যতম প্রধান বিষয় রামায়ণ বা রামকথা।

গুজরাট ও রাজস্থানের সমাজ জীবনে ও ইতিহাসে ভীলদের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবদান আছে। ভীলদের ভীলোড়ি রামায়ণ জনপ্রিয় রামায়ণ। লোককথার আকারে সতেরটি সর্গে এই রামায়ণ রচিত। ভজনের সুরে পাঠ করা হয়। যা শেষ হয় আরতির মধ্যদিয়ে। প্রতিটি সর্গে চোদ্দ থেকে তিরিশটি লাইন। প্রথমে বড়-গনেশ বা গণপতি, মহাদেব, রাম ও সীতা এবং হনুমানের বন্দনা। তাঁদের বিশ্বাস ভীল-রামায়ণের রচয়িতা বাল্মিকী ভীল ছিলেন। ভীলদের বাল্মিকী হলেন ভালিও। প্রথমে ভালিওর কাহিনী, তারপর রামকাহিনী, রাজা দশরথ, বিশ্বামিত্র মুনি ও তাঁর যজ্ঞ — যেখানে রাক্ষসদের উৎপাত, লক্ষ্মণ, রামের হরধনু

ভঙ্গ ও সীতাকে বিয়ে, রামের স্পর্শে পাথর থেকে অহল্যার পুনর্জন্ম, কৈকেয়ীর নির্দেশে রামের চোদ্দ বছর বনবাস, রামের সঙ্গে সীতা ও লক্ষ্মণের বনগমন। রাম সীতাকে অরণ্যে নানা ভয়ের কথা উল্লেখ করে যেতে বারণ করলেও সীতা শুনবেন না। সীতার কথা শুনলে নারীবাদীরা রেগে যাবেন। সীতা বলছেন, তিনি রামের ছায়া অতএব রামকে ছেড়ে থাকতে পারবেন না। প্রথম থেকে সপ্তমসর্গ পর্যন্ত বাল্মিকী রামায়ণের-ই অনুসরণ। আট থেকে ১৬ সর্গ পর্যন্ত ঘটনা একই ভাবে এগোয়। রামের সঙ্গে গুহকের দেখা হয়। গুহক একজন ভীল রাজা। ভরত চিত্রকুট পর্বতে যাবে। রাম তাঁর পাদুকা সিংহাসনে রেখে রাজত্ব করতে নির্দেশ দেবেন। অযোধ্যায় ফিরবেন না। লক্ষ্মণ সূর্পনখার নাক কান কাটবেন। দুই ভাই সুন্দর মৃগয়া শিকারে বেরিয়ে যাবেন। সীতাকে রাবণ হরণ করবেন। এবার শালিনের কাহিনী — যে নিজে একজন ভীল নারী। হ্রদের ধারে রামের সঙ্গে সুগ্রীব ও হনুমানের দেখা হবে। হনুমান লঙ্কায় যাবে। সীতাকে সংবাদ দেবে রাম তাঁকে মুক্ত করতে আসছেন। হনুমানের লঙ্কা কান্ড। সমুদ্রে সেতু বাঁধা। হনুমানের লঙ্কাকান্ড দেখে রাবণ রাক্ষসদের নিয়ে হনুমানকে বধ করতে আসবেন। এবার রাম রাবণের যুদ্ধ। একদিকে বানর বাহিনী অন্যদিকে রাক্ষস বাহিনী। তুলকালাম যুদ্ধ। বানর বাহিনী গাছ পালা উপড়ে নিয়ে, পাহাড় পর্বত তুলে নিয়ে রাক্ষসদের আক্রমণ করবে। রাম-লক্ষ্মণও তির ছুঁড়ে রাক্ষসদের মারবে।

সতের অধ্যায়ে সীতা মুক্ত কিন্তু তাঁকে অগ্নিপরীক্ষা দিতে হবে। শেষপর্যন্ত রাম-সীতা-লক্ষ্মণ অযোধ্যা ফিরবেন। সুখে শান্তিতে বসবাস করবেন। রামরাজ্যে সবাই সুখী হবে। রামায়ণ শেষ হবে প্রার্থনা দিয়ে। সবশেষে আরতি ও রামকে প্রণাম। ভীল রামায়ণে ভীল সংস্কৃতিরই প্রভাব। তা নাহলে এটি বাল্মিকী রামায়ণের অনুরূপ।

গুজরাটের আদিম উপজাতি দাবলাসরা সুরাটজেলায় বসবাস করেন। এঁরা কৃষিমজুর। হিন্দুদের দেওয়ালির আগে বা পরে ঝলমলে পোশাক পরে গান করেন ও নাচেন। মাথায় মুকুট, গায়ে নানারকম অলঙ্কার পরেন, বাঁ-হাতে ময়ূর পালক আর ডান হাতে ছড়ি নিয়ে, পরস্পরকে ছড়ি দিয়ে আঘাত করতে করতে গ্রাম থেকে গ্রামে ঘোরেন। নাচ ও গানে প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে চারপাশ। এঁদের এই গানের একরকম গানকে বলা হয় পাভারো। পাভারো-তে থাকে রামকাহিনী। এই রামকাহিনীতে রাম-সীতার বিয়ে হয়ে দাবলাসদের সংস্কৃতি অনুযায়ী। অযোধ্যার রাজা দশরথ রায় আর তাঁর পুত্র শ্রী রঘুপতি। এই কাহিনীতে রামের বয়স নয় আর সীতার বয়স সাত। ন-বছরের রাম স্লেট ও দোয়াত-কালি নিয়ে বিদ্যালয়ে যায়। বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ হলে হলে রামের বিয়ের প্রস্তাব আসে। সীতার সঙ্গে রামের বিয়ে ঠিক হয়ে গেলে গ্রামের সবাই অরণ্যে গাছের গুঁড়ি সংগ্রহে যায়। যাদের বলবান বলদের গাড়ি আছে তারা দ্রুত শোভাযাত্রায় এগোল, যাদের পুরোনো বলদ তারা ধীরে ধীরে। বিয়ের শোভাযাত্রা অবাধপুর পৌঁছল। ওখানেই রাম-সীতার বিয়ে হবে। ছাদ্‌নাতলায় রাম ও সীতার বিয়ে হতে যাচ্ছে এমনসময় জ্যোতিষি পাঁজি দেখে বললেন, সীতা হরণ হবে। প্রথম বেদিতে রাম-সীতা বিয়ের মন্ত্রপাঠে শপথ নিল; দ্বিতীয় বেদিতে ভেরি বেজে উঠল; তৃতীয় বেদিতে বিয়ে সম্পন্ন হল, চতুর্থ বেদিতে রামের হাতে সীতাকে সমর্পণ করা হল। আরেকজন বড় জ্যোতিষী পাঁজিপুঁথি নিয়ে এল এবং সবাই মিলে

ভবিষ্যতবাণী করল সীতাকে কেউ হরণ করবে।

এবার অন্য একটি পালার শুরু হল সোনার হরিণ নিয়ে। লক্ষ্মণ একটা কুঁয়ো খুঁড়ল। সীতা একটা ডুমুর গাছ লাগাল। প্রতিদিন সীতা গাছটিতে জল দেয়। কিন্তু একটা হরিণ এসে খেয়ে যায়। সীতা রামকে বললেন দোষীকে ধরে আনতে। রাম ও লক্ষ্মণ যখন হরিণ বধ করে ফিরে এলেন, দেখেন সীতা পর্ণকুটিরে নেই!

পর্ণকুটির শূন্য,
শূন্য বাগান,
উড়ছে বায়স,
কান্নায় ভেজা রাম,
শূন্য দৃষ্টি, চেয়ে আছেন
সীতার পদ চিহ্নের দিকে....।

সীতাকে খুঁজতে হনুমান লঙ্কায় গেল। নানা মজার মজার কান্ড করল ও বীরত্ব প্রকাশ করল। রাজার কানে কথাটা গেল। তিনি কয়েকজনকে পাঠালেন হনুমানকে ধরতে। তারা হনুমানকে পাকড়াও করে বলল, কীভাবে সে মরতে চায়? হনুমান তার লেজে ন্যাকড়া বেঁধে আগুন ধরাতে বলল। তারা তাই করল, হনুমান সারা লঙ্কায় আগুন ধরিয়ে দিল। কিন্তু ভুল করে নিজের হাত লেজে লাগিয়ে মুখে ঘষতে, মুখ পুড়ে কালো হয়ে গেল। সেই থেকে সব হনুমানের মুখ কালো।

মধ্যপ্রদেশের আগারিয়াস উপজাতির রামকথা এই রকম : রাবণকে বধ করার পর রাম বললেন রাবণ বধ হয়েছে, আর কেউ নেই। সীতা বললেন, হাজার মাথা আরেকজন রাবণ পাতালে আছে। রাম ঐ রাবণকে পায়ে আঘাত করলেন কিন্তু তিরগুলো পা থেকে তুলে নিয়ে রাবণ তিরগুলোকে বলল : যে তোমাকে পাঠিয়েছে তাকে হত্যা কর! তিরগুলো ফিরে গিয়ে রামকে বুকে আঘাত করল। রাম জ্ঞান হারালেন। বুদ্ধিমতী সীতা ভয় কাটিয়ে লোহিপুর গেলেন এবং সেখানকার লোগান্ডি রাজাকে বললেন : আগুয়াসুর, লোহাসুর, আপনার সঙ্গে থাকা সমস্ত দেবতাদের একটা মাটির আধখানা পাত কাঠকয়লা বোঝাই করে পাঠান। লোগান্ডি রাজার মাত্র দুজন দেবতা ছিল, তিনি তাদের কাঠকয়লা নিয়ে পাঠালেন, কাঠকয়লার ধোঁয়ায় সীতা কালো হয়ে গেলেন। এক হাতে কাঠকয়লার পাত্র অন্য হাতে তরবারি নিয়ে সীতা রাবণের মাথা কেটে ফেললেন। আগুয়াসুর ও লোহাসুর তার সমস্ত রক্ত চেটেপুটে খেয়ে নিল যাতে সে আর জন্ম নিতে না পারে। দুটো দানব জন্ম নিল। তারা সীতাকে বলল তাদের কোথাও থাকতে দিতে হবে। তা নাহলে তারা সীতাকে গিলে ফেলবে। সীতা তাদের লোগান্ডি রাজার কাছে নিয়ে গিয়ে বললেন : ওদের চুল্লিতে পুরে দিন। ডাইনিদের তাড়িয়ে দেবে। তারপর মাটিরপাত্রে কাঠকয়লা জ্বালালেন সীতা। ধোঁয়ায় ভরে গেল। মদাপ লোগান্ডি রাজা সীতার পায়ে পড়লেন। সীতা চলে গেলেন। সেই থেকে আগারিয়াসরা চুল্লির ধোঁয়া এড়িয়ে চলে। আগে চুল্লির ধোঁয়ায় মানুষ মরত, এখন তাদের মাতাল করে। তাই তারা মনে করে ধোঁয়া এড়িয়ে চলাই ভালো।

গোন্ডদের রামকথায় লক্ষ্মণকে ঘরজামাই রাখার কথা বলা হয়েছে। কনের বাবা-মা

ভাবলেন লক্ষ্মণের সঙ্গে তাঁদের মেয়ের যদি বিয়ে হয় সে এত বিখ্যাত হয়ে যাবে যে তাকে নিয়ে যুদ্ধ বাধতে পারে। একটা বাঁশের ভেতর কনেকে পুরে, বাঁশটির সঙ্গে লক্ষ্মণের বিয়ে দিলেন। বরকে তাঁরা বললেন বাড়ি পৌঁছে তবেই লক্ষ্মণ যেন বাঁশটি খোলেন। কিন্তু বাঁশটির ভেতর কি আছে দেখার জন্য লক্ষ্মণের তর সইল না। তিনি বাঁশটির মুখ খোলা মাত্র বিদ্যুৎ হয়ে কনে বাইরে বেরিয়ে আকাশে মিলিয়ে গেল। লক্ষ্মণ তৎক্ষণাৎ ঘাসের তির-ধনু বানিয়ে বিদ্যুৎ-রূপী কনেকে অনুসরণ করলেন। গোন্ডরা মনে করেন আকাশে যে বজ্রের শব্দ শোনা যায় তা আর কিছুই না, লক্ষ্মণ কনেকে ধরতে ছুটছেন।

গোগিয়া প্রধানদের কাহিনীতে আছে মৃত রাবণের রক্ত থেকে একটি মেয়ে জন্ম নেয়। সে লক্ষ্মণ জাতি-র কাছে গিয়ে তাকে বিয়ে করতে বলে। লক্ষ্মণ প্রত্যাখান করে এবং তারপর ঘুমিয়ে পড়ে। মেয়েটি তার হাতের বালা ভেঙে লক্ষ্মণের বিছানার পাশে রেখে যায়। ঘুম ভাঙলে ভাঙা-বালা দেখে লক্ষ্মণ প্রচন্ড রেগে মেয়েটিকে হত্যা করতে উদ্যত হয়। কিন্তু মেয়েটি বিদ্যুৎ হয়ে আকাশে উড়ে গিয়ে কালোমেঘের আড়ালে লুকিয়ে পড়ে।

ভুইয়ারা মনে করে কুম্ভকর্ণ একজন ঋষি। যিনি নিজের পাপের প্রায়শ্চিত্তে ধ্যানে বসেন। লঙ্কাপুর একটা গ্রাম যেখানে প্রাচীন বৈগা দম্পতি বাস করেন — যাঁরা আগুনের জন্ম দেন। বৈগা কাহিনী অনুযায়ী রাম-লক্ষ্মণ বান্দাগরি অঞ্চলে বাস করতেন বোন আর্জুনির সঙ্গে। অর্থাৎ এ কাহিনীতে সীতা রাম-লক্ষ্মণের বোন।

সাওরাদের গল্প আবার অন্যরকম। রাজা দশরথ জয়িতা নগর শাসন করতেন। প্রজাদের সঙ্গে কথা বলার সময় তিনি হাত নেড়ে অঙ্গভঙ্গি করতেন। এতে প্রজারা রুষ্ট হয় এবং একদিন সবাই সমবেত হয়ে ভৎর্সনা করে : আমাদের দিকে আঙুল নেড়ে নেড়ে কথা বলেন, আপনার আঙুলে পচন ধরবে। কিছুদিনের মধ্যেই রাজার আঙুলে পচন ধরে, পূঁজ বের হতে থাকে। রাজা ওষুধ নিলেন, বিখ্যাত সব বৈদ্য ও যাদুকরদের ডেকে পরামর্শ নিলেন, কিছুতেই কিছু হল না। তখন পাঁজিপুঁথি দেখে রাজার সভাপণ্ডিত বললেন, মহাত্মন, আপনার পুত্র রাম ও লক্ষ্মণকে নির্বাসনে পাঠান তাহলেই এই ক্ষত সেরে যাবে। রাজা এই পরামর্শ মেনে নিতে পারলেন না। দীর্ঘদিন কেটে গেল। কিন্তু আঙুলের ক্ষত যখন সহ্যের সীমা ছাড়াল, তিনি পুত্রদের ডেকে বললেন: তোমরা অরণ্যে যাও, বারো বছরের মধ্যে আমার জন্য ওষুধ খুঁজে নিয়ে আসো। রাম-লক্ষ্মণ অরণ্যে গেলেন এবং বারো বছর পরে রাজার জন্য ওষুধ খুঁজে নিয়ে এলেন। সেই ওষুধ রাজার আঙুলে লাগিয়ে দিলেন। রাজার রোগ সেরে গেল। সেই থেকে কেউ যদি কারো দিকে আঙুল তুলে কথা বলে লোকে বলে তার কুষ্ঠ হবে। এখানে দুটো জিনিশ লক্ষ্য করার এক রাজা দশরথের রাজ্যে অর্থাৎ ট্রাইবাল সমাজে প্রাচীন কাল থেকেই একটা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বিরাজ করছে, যেখানে গোষ্ঠী সর্দারকে প্রজারা শাস্তি দিতে পারে। দুই. আদিবাসী সমাজ গাছগাছড়া থেকেই তাদের প্রয়োজনীয় ওষুধ খুঁজে নেয়—যা কুষ্ঠর মতো রোগও সারিয়ে দেয়। এখানে রাজা দশরথের আঙুলে কুষ্ঠ হয়েছিল, তিন. পুত্র স্নেহে রাজা পুত্রদের সরাসরি বনবাসের শাস্তির কথা না বলে তাঁর নিরাময়ের জন্য ওষুধ খুঁজে আনতে বললেন। পুত্রদের বনবাসে পাঠানো রাজার পক্ষে ও শাস্তি। আদিবাসী সমাজ ব্যবস্থায় কেউ যদি অপরাধ করে তার প্রায়শ্চিত্তে নিজেকেও শাস্তি দিতে হয়।

উড়িয্যার বোন্ডদের সীতাকে নিয়ে একটি কাহিনী—রাম যখন গাছের বাকল পরে বনে বনে ঘুরছেন আর গাছের তলায় মাঝে মাঝে বিশ্রাম নিচ্ছেন, একদিন তিনি একপাত্র তালের রস সামনে দেখলেন। তাঁর বেশ তৃষ্ণা পেয়েছিল। তিনি তালরস খেয়ে বেশ তৃপ্তি পেলেন। কিন্তু ঐ তালের রস বা তাড়ি খেয়ে রাম এমন মাতাল হলেন যে সীতার কাছে কিছুতেই আসতে চাইলেন না। রামের কি হয়েছে দেখতে সীতা নিজেই রামের কাছে এলেন। যখন তিনি রামের মাতাল হওয়ার কারণ জানতে পারলেন, তাড়ির পাত্রে এমন লাথি মারলেন যে পাত্রটা গাছের ডগায় উঠে গেল। সীতা চিৎকার করে বললেন: এবার থেকে যে তাড়ি খেতে চাইবে তাকে গাছের ঐ ডগায় উঠে খেতে হবে। সেই থেকে বোন্ডরা তালগাছের গা কেটে তালরস সংগ্রহের প্রথমদিন পাত্রটা উৎসর্গ করে। প্রথম রস কখনো মেয়েদের খেতে দেয় না। সীতার জন্য তাদের অত ওপরে উঠে রস সংগ্রহ করতে হয়।

এই কাহিনীর-ই অন্য একটি ভাষ্য হল : মহাপুরব গাছের গুঁড়ির নিচে গর্ত করে রস খেতেন। রস ছিল বেশ মিষ্টি। এই রস তার এত ভাল লেগে গেল যে, ওখানেই বেশিরভাগ সময় থাকেন। সীতা তাঁর কি হয়েছে দেখতে এলেন। সীতাকে দেখে মহাপুরব ভয় পেয়ে গেলেন। সীতার কাছ থেকে পালাতে চাইলেন। সীতা বুঝতে পারলেন গাছটাই যত নষ্টের মূল। সীতা গাছের শেকড় উপড়ে নিয়ে সমুদ্রের জলে ফেলে দিলেন। গাছটার ঘাড় ধরে এমন নিঙড়োলেন যে সেটা লম্বা হয়ে গেল। গাছকে অভিশাপ দিলেন : এবার থেকে তোমার রস শেকড়ে থাকবে না, ডগায় থাকবে।

আদিবাসী জনগোষ্ঠীর প্রচলিত বিশ্বাস তাঁরা রামায়ণের কোন না কোন চরিত্রের উত্তরাধিকার বহন করছেন। যেমন

শবরী — সাওরা

রাম — ভীল নারীরা, রামের পুজো করেন

রাবণ — গোন্ড। গোন্ডরা মেঘনাদের পুজো করেন। কোন অশুভ থেকে মুক্তি পেতে মেঘনাদের কাছে প্রার্থনা জানান।

বোন্ডরা বলেন : সুদূর অতীতে লক্ষ্মণের বোন মহাপ্রভু বাড়ির বাইরে নগ্ন অবস্থায় চাল পাছড়াচ্ছিল। পাশেই পড়েছিল পরনের বাকল। দুটো পাহাড় ঘাড়ে করে লক্ষ্মণ সেই পথে এলেন। দূর থেকেই বোনকে নগ্ন অবস্থায় বাড়ির কাজে ব্যস্ত দেখলেন। ফলে পাহাড় দুটো নামিয়ে নিজের উপস্থিতি জানান দিতে তার দিকে একটা পাথর ছুঁড়লেন। কিন্তু তাতে যখন তার হুঁশ হল না, তিনি একটা তির ছুঁড়লেন। তাতেও কোন কাজ হল না। তখন লক্ষ্মণ একটা কুকুর পাঠালেন। এবার বোনের হুঁশ হল, ভাই আসছে। তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে যেহেতু বাকলটা পরতে পারলেন না তার একটা টুকরো নিয়ে একটা পাত্রের আড়াল নিলেন। সীতা পাতালে প্রবেশ করে কাপুরছুয়া-তে বেরিয়ে এলেন। সে যখন পাতালে প্রবেশ করে, একটা শব্দ হয়, লক্ষ্মণ বুঝতে পারে কি ঘটনা ঘটেছে এবং বোনের খোঁজে কাপুর ছুয়া এলেন। বোনকে পাতাল থেকে তুলতে গিয়ে তার হাতের মুঠোয় একগুচ্ছ চুল উঠে এল। কিছু দূরে ছুঁড়ে দিতেই এক চাকলা ঘাস জন্মাল। বোন পাতাল থেকে উঠে এল কিন্তু মাথায় চুল নেই—নেড়া, পরণে এক চিলতে কাপড় ছাড়া কিছুই নেই — প্রায় নগ্ন। বোন ভাইয়ের

আড়াল নিতে, লক্ষ্মণ বললেন : যেহেতু তুমি নেড়া, তোমার পরনে একটুকরো ন্যাকড়া, ভবিষ্যতে তোমার ছেলেমেয়েরা বোন্ডো নামে পরিচিত হবে।

সাঁওতালরা বেশ গর্বের সঙ্গেই বলে রাম-রাবণের যুদ্ধে তারা রামকে সাহায্য করেছিল। অযোধ্যার কাছেই অরণ্যে তারা শিকার করে। তাদের লোককথায় আছে রাম-লক্ষ্মণ বড় বড় পশু-প্রাণী যেমন শিকার করত, রাক্ষসও শিকার করত। আরেকটি কাহিনীতে আছে একজন ডোম রাক্ষস মেরেছে বলে রামের কাছে পুরস্কার চায়। আসলে রাম সেই রাক্ষসদের মেরে ছিলেন। ডোম প্রমাণ করতে পারে না সেই রাক্ষস মেরেছিল, ফলে পুরস্কার পায় না।

বিহারের ছোটনাগপুর অঞ্চলে বীরহোর আদিবাসীরা থাকেন। বাঁদর, খরগোস শিকার করা আর জঙ্গলের ফলমূল সংগ্রহ তাদের কাজ। বীরহোরদেরও রাম কাহিনী আছে। এদের ভগবান সিংবোঙা এই পৃথিবী সৃষ্টি করে রাবণ রাজাকে শাসন করতে দেন। কিন্তু রাবণ নরখাদক হয়ে ওঠে। ভয়ার্ত মানুষরা ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানায় : বাঁচান! ...ভগবান তাদের বলেন : ধৈর্য ধর, কিছুদিন বাদেই আমি মানুষের ঘরে জন্ম নিয়ে রাবণকে বধ করব।

দুজন রাজা ছিলেন। একজন জনক অন্যজন দশরথ। কারো কোন সন্তান ছিল না অর্থাৎ উত্তরাধিকারী নেই। রাজা দশরথের সাত রানি তবু তাদের কোন ছেলেপুলে নেই। তাঁর সঙ্গে এক ব্রাহ্মণের দেখা হল। ব্রাহ্মণ রাজাকে নানা স্তবস্তুতি, যোগসত্ত্বের কথা বললেন যাতে তাঁর পুত্র হয়। সবকিছু করে বিদায় নেবার সময় ব্রাহ্মণ রাজাকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিলেন রাজা তাঁর প্রথম সন্তানকে ব্রাহ্মণের হাতে তুলে দেবেন। রাজার চার পুত্র হল। কিছুদিন বাদে ব্রাহ্মণ ফিরে রাজাকে তাঁর প্রতিশ্রুতি রাখতে বললেন। রাজা ভরত ও শত্রুঘ্নকে ব্রাহ্মণের হাতে তুলে দিলেন। ব্রাহ্মণ তাদের নিয়ে পথ চলতে চলতে একটা মোড়ের মাথায় এসে দুই ভাইকে বললেন — এখান থেকে দুটো রাস্তা — একটা দারুণ সুন্দর এক নগরে গেছে অন্যটা বাঘ-ভাল্লুকে ভর্তি জঙ্গলে গেছে। কোন পথে আমরা যাব? ভরত-শত্রুঘ্ন নগরের পথ ধরতে চাইলেন। ব্রাহ্মণ ছেলেদের পচ্ছন্দ দেখে বুঝতে পারলেন এরা দশরথের প্রথমে জন্মনেওয়া সন্তান না। রাজার কাছে ফিরে এসে তিনি বললেন : এরা আপনার প্রথম সন্তান না, আপনি তাদের দিন, রাজা দশরথ তখন রাম-লক্ষ্মণকে দিতে বাধ্য হলেন। ব্রাহ্মণ তাদের নিয়ে যখন সেই মোড়ের কাছে এসে একই প্রশ্ন করলেন, দুইভাই বিপদ সংকুল জঙ্গলের পথে যেতে চাইল। ব্রাহ্মণ বুঝতে পারলেন এরাই রাজার প্রথম সন্তান। তিনি জঙ্গলের পথেই দুই ভাইকে নিয়ে অগ্রসর হলেন। পথে পড়ল রাজা জনকের দেশ। জনকের দেশে তখন খরা ও দুর্ভিক্ষ। আদিবাসী মঞ্চ রাজাকে বললেন, বৃষ্টি হতে পারে যদি রাজা নিজে জমি চাষ করেন। রাজা নিজে জমি চাষ করতে লাগলেন। লাঙলের ফলায় সুন্দর একটা বাচ্চামেয়ে উঠে এল। লাঙলের ফলায় (সিতানে) যেহেতু তাকে পাওয়া গেল নাম হল সীতা। রাজা তাকে ঘরে এনে নিজের মেয়ের মতো করে মানুষ করলেন। প্রতিদিন সকালে রাজা জনকের স্ত্রী—রানি কাঁচাগোবর লেপে ছঁচ দেন যাতে রাজার শাপ মুক্তি ঘটে। একদিন রানির শরীর খারাপ, সীতাকে ঘুঁটে দিতে বললেন। উঠোনে একটা বিরাট ধনু পড়েছিল যা কেউ তুলতে পারত না। সেদিন রাজা অবাক বিস্ময়ে দেখেন ধনুটা কেউ সরিয়েছে। এ ব্যাপারে সীতাকে তিনি জিজ্ঞেস করলে। সীতা বললেন গোবর ছঁচ দিতে গিয়ে

সে সরিয়েছে। রাজা ও রানি সীতার ক্ষমতা দেখে আশ্চর্য হলেন।

রাজা জনক সীতার বিয়ে দিতে চান। তিনি ঘোষণা করলেন যে এই ধনুটা তুলতে পারবে তার সঙ্গেই সীতার বিয়ে দেবেন। দূর থেকে কাছ থেকে অনেকেই এলো, ধনুক তোলা তো দূরের কথা — নাড়াতেই পারল না। এমন সময় সেই ব্রাহ্মণের সঙ্গে রাম-লক্ষ্মণ সেখানে এলেন। রাম-লক্ষ্মণকে চেষ্টা করতে বললেন। লক্ষ্মণ বলল : না, তুমিই চেষ্টা কর। আমি যদি ওকে জিতে নিই তোমার পক্ষে ট্যাবু হয়ে যাবে। রাম ধনুকটাকে একটা খেলনার মতো হাতে তুলে নিলেন এবং তির সংযোগ করে ছুঁড়লেন — দূরান্বয়ে বজ্রেরধ্বনি শোনা গেল! যারা বিকলাঙ্গ ছিল তারা সোজা হয়ে গেল, যারা অন্ধ ছিল চোখ ফিরে পেল! রাম সীতাকে বিয়ে করলেন। ব্রাহ্মণ রাম-সীতা-লক্ষ্মণকে নিয়ে রাজা দশরথের কাছে গেলেন। দু-এক বছর তাদের সুখেই কাটল। কিন্তু একদিন সকালে স্নান সেরে এসে রাম লক্ষ্মণ দেখলেন দরজার চৌকাঠে রাজা দশরথের হাতের লেখা। লেখাটিতে তাদের জঙ্গলে বনবাসে যেতে বলা হয়েছে ও ভরত-শত্রুঘ্নকে রাজ্যপাট চালানোর কথা ঘোষণা করা হয়েছে। পিতৃ আদেশ রাম লক্ষ্মণ মেনে নিলেন। রাম-সীতা-লক্ষ্মণ বনবাসে গেলেন। বনের ভেতরে উথলু বীরহোরদের মতো পর্ণকুটির বেঁধে বসবাস করতে লাগলেন। একসময় তাঁরা তেঁতুল গাছের নিচে পর্ণকুটির বাঁধলেন, কারণ তেঁতুল পাতা এত বড় ছিল যে বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচাত। কিন্তু রাম লক্ষ্মণকে বললেন! দুঃখ কষ্ট সহ্য করার জন্যই আমাদের বনবাস দেওয়া হয়েছে। তেঁতুলপাতা যদি বৃষ্টিকে আটকে রাখে, বনবাসে এসেও আমাদের আরামে থাকা হবে। লক্ষ্মণকে রাম বললেন তির মেরে তেঁতুলপাতাকে ছিন্নভিন্ন করে দাও। লক্ষ্মণ তাই করলেন। সেই থেকে তেঁতুলপাতা ছিন্ন, তার ভেতর দিয়ে বৃষ্টি পর্ণকুটিরে ঝরে পড়তে লাগল। একইভাবে ঘুরতে ঘুরতে তারা খেজুরগাছের নিচে এসে বাসা বাঁধল। তখনকার দিনে খেজুর পাতাও বড় ছিল। বৃষ্টির হাত থেকে তাঁদের বাঁচাতে শুরু করল। রামের নির্দেশে লক্ষ্মণ খেজুর পাতাতেও তির ছুঁড়ে চিরে চিরে দিল। সেই থেকে খেজুর পাতাও আজ আমরা যেমন দেখছি তেমন হল। রাম-লক্ষ্মণ-সীতা যাযাবর জীবনই কাটাতে লাগলেন। আজ এখানে কাল ওখানে উথলুদের মতো পর্ণকুটির বেঁধে থাকেন। ফলমূল সংগ্রহ করেই তাঁদের জীবন কাটে। সীতা দুই ভাইকে খেতে দেওয়ার সময় রামকে বলেন 'খাও', লক্ষ্মণকে বলেন 'নাও'। এতে লক্ষ্মণের অভিমান হয়। খাবার না খেয়ে সে শুধু মাটি খেয়েই থাকে। অর্থাৎ উপবাসে থাকে।

তারপর ঘটল সেই ঘটনা। পর্ণকুটিরের আশেপাশে সীতা একটা ছোটখাট সুন্দর হরিণ দেখতে পেলেন। সীতা রামকে হরিণটা শিকার করতে বললেন। রাম-লক্ষ্মণ হরিণটা কাছে আসার অপেক্ষা করলেন। পর্ণকুটিরের কাছে আসতেই তাকে তাড়া করলেন, তাড়া করতে করতে তাঁরা পর্ণকুটিরের থেকে অনেক দূরে চলে এলেন। কিন্তু হরিণকে ধরতে পারলেন না। ইতঃস্তত করে লক্ষ্মণ কুটিরে ফিরে এলেন। সীতার হাতে মন্ত্রপূত একমুঠো সরষে দিয়ে বললেন, যদি কোন ভিখিরি আসে, একটা একটা সরষে ছুঁড়বে আর বলবে : একটা সরষে-য় এক ঘন্টা একজন মরবে, দুটোতে দুঘন্টা মরবে, তিনটেতে....এভাবে ছুঁড়ে যাবে। এবার লক্ষ্মণ রামের উদ্দেশে রওনা হলেন।

লক্ষ্মণ চলে যাওয়ার পরে পরেই রাবণ রাজা রথে চড়ে আকাশ থেকে নামলেন। সীতা মন্ত্রপূত একটা সরষে ছুঁড়ে দিলেন, রাবণ একঘন্টা মৃত পড়ে রইলেন, তারপর আবার একটা, রাবণ আবার একঘন্টা মৃত.....এভাবেই চলল। রাবণ সীতাকে বললেন, একসঙ্গে সব সরষে কেন ছুঁড়ে দিচ্ছ না, তাহলে আমি যা মরব আর বেঁচে উঠতে পারব না। তোমারও বার বার ছোঁড়ার কষ্ট কমবে। সীতা মুঠোর সব সরষে একসঙ্গে ছুঁড়ে দিলেন, রাবণ একমুঠো ছাই হয়ে গেলেন। তারপর সেই ছাইভস্ম থেকে রাবণ লাফ দিয়ে উঠে সীতার চুলের মুঠি ধরে তাকে নিজের রথে তুলে আকাশপথে রওনা হলেন। হরিণ ধরতে না পেরে সন্ধেয় দুভাই পর্ণকুটিরে ফিরে দেখেন সীতা নেই।

দুভাই বুক চাপড়াতে চাপড়াতে হা-হুতাস করলেন। একটা ভালুককে ডেকে জানতে চাইলেন সীতা কোথায়? ভালুক জলপড়ামন্ত্র-এ মাথা নেড়ে বলল,: রাবণ রাজা সীতাকে চুরি করে নিয়ে গেছে। কাছেপিঠে সীতা নেই। অনেকদূরে চলে গেছে। একথা জেনে দু'ভাই সীতার খোঁজে বেরিয়ে পড়লেন। হনুমান তখন মায়ের গর্ভে। গর্ভ থেকেই চেঁচিয়ে বলল, অপেক্ষা কর আমি আসছি। মাতৃগর্ভ থেকে জন্ম নিয়েই হনুমান রাম-লক্ষ্মণের সঙ্গে সীতা উদ্ধারে চলল।

তারা একটা কুলগাছের কাছে এসে জিগ্যেস করল: তুমি কি রাবণ রাজা সীতাকে হরণ করে নিয়ে যাচ্ছে, দেখেছ? কুলগাছ বলল, হ্যাঁ, এ-পথেই গেছে। আমি ধরেছিলাম। এই দেখো সীতার কাপড়ের একটা টুকরো এখানে লেগে আছে। কুলগাছের কাঁটায় লেগে থাকা টুকরোটা হাতে নিয়ে রাম কুলগাছকে ধন্যবাদ জানালেন। বললেন, আজ থেকে তোমার আর মৃত্যু নেই। কেউ উপড়ে ফেলে দিলেও একটা শেকড় থেকে আবার গজিয়ে উঠবে।

আরো কিছুদূর এগিয়ে তাঁরা এক সারসকে দেখতে পেলেন। জিগ্যেস করলেন সীতাকে কেউ নিয়ে যাচ্ছে দেখেছ কি না? সারস বিরক্তিভরে বলল, সীতাটীতা জানি না, আমি নিজের পেটের জ্বালায় মরছি। রাম লক্ষ্মণকে বললেন সারসটাকে ধরতে। লক্ষ্মণ তার ঘাড়টা ধরে এমন টান দিলেন যে সেই থেকে সারসের ঘাড় লম্বা।

আরো কিছুটা এগিয়ে তাঁরা কাঠ বেড়ালীর দেখা পেলেন। কাঠ বিড়ালী বলল, হ্যাঁ সে এ-পথেই সীতাকে নিয়ে যেতে দেখেছে। রাম তাকে আশীর্বাদ করলেন, আজ থেকে আকাশ থেকে নিচে পড়লেও তোমার কিছু হবে না।

শেষপর্যন্ত রাম-লক্ষ্মণ, হনুমান সমুদ্রতীরে পৌঁছলেন। আর এগোনো যাবে না। হনুমান রামকে সমুদ্রে তির ছুঁড়তে বললে রাম তির ছুঁড়লেন। তিরের ডগাটা মাঝসমুদ্রে উঠে থাকল। রাম হনুমানকে নিজের আংটি দিলেন যাতে সীতা হনুমানকে রামের দূত হিসেবে চিনতে পারেন। হনুমান এক লাফে সমুদ্রের মাঝের তীরে পা ছুঁয়েই দ্বিতীয় লাফে অন্য তীরে চলে গেল। সেখানে হনুমান দেখল অনেকগুলি মেয়ে সীতাকে চান করাবে বলে একটা ঝরনা থেকে জল নিয়ে যাচ্ছে। তারা এমন মন্ত্রপূত জল ঢালছে যাতে দু:খে ভেঙে পড়া সীতার মলিন রূপ নিজস্ব রূপ ফিরে পায়। কিন্তু কোন লাভ হচ্ছে না। সীতা একইরকম শোকে মুহ্যমান। পাখির ছদ্মবেশে হনুমান একটি মেয়ের কাছে গেল, বৃদ্ধা। সে কিছু বোঝার আগেই

তার পাত্রে রামের আংটিটি ফেলে দিল। বলল, তোমার নতুন রানিকে বলো পোশাক ছড়িয়ে এই কলসির জলে স্নান করতে। বৃদ্ধা তাই করল। সীতার পোশাকে আংটি খসে পড়ল। আংটি দেখে সীতা বুঝতে পারলেন আংটিটা রামের। সীতা বৃদ্ধাকে জিগ্যেস করলেন, তিনি কোথায় এটা পেলেন? বৃদ্ধা বললেন একটা পাখি দিয়েছে।

পাখির ছদ্মবেশে হনুমান সীতার সঙ্গে দেখা করল। সীতার খাওয়ার জন্য রাবণ পাঁচটা আম পাঠিয়েছে। সীতা দুটো খেয়েছে। একটা হনুমানকে দিয়ে বাকি দুটো আম রাম-লক্ষ্মণের জন্য নিয়ে যেতে বললেন। হনুমান তিনটে আমই খেয়ে ফেলল। সীতাকে জিগ্যেস করল, এরকম আম কোথায় ফলে? সীতা বললেন, রাবণের বাগানে। ভয়ঙ্কর সব রাক্ষস বাগানটা পাহারা দিচ্ছে। হনুমান সেই বাগানে গেল, ইচ্ছেমত আম খেয়ে বাগান তছনছ করল। রাক্ষসেরা পাখিটা ধরার হাজার চেষ্টা করেও পারল না। হনুমান হাসতে হাসতে বলল, আমাকে ওভাবে মারতে পারবে না। শহর থেকে যত পারো তেল আর কাপড় এনে আমার লেজে জড়িয়ে দাও। তেল ঢেলে আগুন লাগিয়ে দাও। আমি তাহলে পুড়ে মরব। রাক্ষসেরা তাই করল। যখন তারা লেজে আগুন ধরিয়ে দিল হনুমান নিজের মূর্তিধরে নগরের এ-ছাদ থেকে ও-ছাদ লাফিয়ে বেড়াতে লাগল। লঙ্কা নগরীর সমস্ত বাড়ি পুড়ে ছাই হয়ে গেল! সীতা হনুমানকে আগুন নেভাতে বলায় হনুমান সমুদ্রে ঝাঁপ দিল। তার বিশাল দেহের চাপে সমুদ্রের জল তীরভূমিতে আছড়ে পড়ল। হনুমান হাত দিয়ে লেজ পরীক্ষা করে দেখল আগুন নিভেছে কী না? দেখল হাতটা কালো হয়ে গেছে। সেই কালো হাত মুখে মুছতে মুখও কালো হয়ে গেল। একটা আবলুস গাছে হাত দিতে সেটাও কালো হয়ে গেল। হনুমানের বিরাট দেহ আর লেজ মিলে সমুদ্রে সেতু হয়ে গেল। সেই সেতু দিয়ে রাম-লক্ষ্মণ লঙ্কায় প্রবেশ করলেন। একদিকে লক্ষ্মণ ও হনুমান অন্যদিকে লঙ্কাবাসীরা — তুমুল যুদ্ধ হল। রাবণ ও এক বৃদ্ধা ছাড়া লঙ্কার সবাই মারা গেল।

রাবণের ক্ষেত্রে দেখা গেল তার মাথা যতবার কাটা হচ্ছে ততবারই তা গজিয়ে উঠছে। এভাবে কিছুসময় চলার পর লক্ষ্মণ ও হনুমান ক্লান্ত হয়ে পড়ল। রামের কাছে সমস্ত খবর পাঠাল। রাম রাবণকে একা পেয়ে মারার নির্দেশ পাঠালেন। রাবণ তাদের বললেন, তোমরা কোনদিনই আমাকে মারতে পারবে না, একমাত্র সেই পারবে যে একটানা বারো বছর উপবাস দিয়ে আছে। হনুমান সুগা পাখির রূপ ধরে রাবণের কাছ থেকে তাঁর মৃত্যু রহস্য জেনে নিল। রাবণ গোপন তথ্য দিলেন, তাঁর প্রাসাদের সোনার দেয়ালের ভেতর মৃত্যুশেল লুকানো আছে। হনুমান ও লক্ষ্মণ সেখানে গেলেন, দেয়াল ভেঙে বাক্স থেকে রাবণের জীবনকে মুক্তি দিলেন। এবার লড়াই শুরু হল। লক্ষ্মণ যেহেতু বনবাসের বারো বছর মাটি ছাড়া কিছু খাননি, রাবণকে বধ করতে পারলেন।

তারপর রাম-লক্ষ্মণ নগরীর একমাত্র জীবিত বৃদ্ধার কাছে গেলেন এবং বললেন : আমরা রাবণ রাজাকে মেরে ফেলেছি, এখন এই রাজ্যপাট আপনার হাতে তুলে দিলাম। আপনি রানিদের যত্ন নেবেন। এমন সময় হঠাৎই সেখানে রাবণের ভাই কুম্ভকর্ণের আবির্ভাব। কুম্ভকর্ণ একটানা বারো বছর ঘুমোতে পারে। সে কোনকিছুই জানে না। রাম-

লক্ষ্মণকে সামনে পেয়ে মুঠোয় তুলে নিয়ে একটা গর্তের ভেতর ছুঁড়ে দিল, যে গর্তের ভেতর কালীমাই বাস করেন। কুম্ভকর্ণ গর্তের মুখে একমুঠো চাল রেখে বলে দিলেন বলি দেওয়ার আগে পশুরা যেভাবে খাবার খায় তোরাও এই চাল খেয়ে নে। দু-ভাই বলল, আমরা এভাবে কখনো কিছু খাই নি। আমাদের যদি দেখিয়ে দাও কিভাবে খেতে হবে আমরা সেইভাবে খেতে পারি। যখন কুম্ভকর্ণ দেখাচ্ছিল কিভাবে হাঁটুমুড়ে চাল খেতে হবে, লক্ষ্মণ কুম্ভকর্ণকে কালীমাই-এর সামনে বলি দিয়ে দিলেন। তখন গর্ত থেকে কালীমাতা বেরিয়ে এসে রাম-লক্ষ্মণকে বললেন, এতদিন রাবণ আমার বলির ব্যবস্থা করত। তোমরা রাবণকে মেরে ফেলেছ। এখন তার কাজ কে করবে? রাম বললেন, তিনি পৃথিবীর যেখানেই যাবেন লোকে তাঁর পুজো করবে ও বলি দেবে। সবাই মনে করে সেই থেকে কালীমাই পৃথিবীতে সবার পুজো পেয়ে থাকেন।

বীরহোররা কেন বাঁদর ধরে খায় এ নিয়েও গল্প আছে। সীতা উদ্ধারে রাম-লক্ষ্মণ ও হনুমান যখন লঙ্কায় প্রবেশ করলেন বীরহোররা সেখানে থাকত। যখন রাবণের লোকরা হনুমানকে কিছুতেই ধরতে পারছিল না, রাবণ বীরহোরদের ডাকলেন। যেহেতু বীরহোররা জঙ্গলে থাকে রাবণ ভাবলেন তাদের পক্ষে হনুমানকে ধরা সহজ হবে। এক বৃদ্ধ বীরহোর দম্পতি চেষ্টা করলেন হনুমানকে ধরতে, পারলেন না। তখন তাদের প্রতি করুণা দেখিয়ে হনুমান বলল, তিন আঙ্গুল গর্ত করে জাল তৈরি কর তাহলেই আমাকে ধরতে পারবে। তারা তাই করল। হনুমান জালে ধরা পড়ল। তারপর বীরহোরদের হনুমান বলল, তোমরা কেন আমাকে মারবে? আমিই নিজেকে স্বয়ং মেরে ফেলছি। হনুমানের লেজে আগুন ধরার গল্প এখান থেকেই শুরু। হনুমান রামের কাছে গিয়ে বললেন, আমার মৃত্যুর পর দেহ সৎকার করবে কে? রাম বললেন, যারা তোমাকে ফাঁদে ফেলেছিল, বীরহোর ও তাদের উত্তরপুরুষরা তোমাকে ও তোমার মতো অন্যান্য বাঁদরদের ধরে খাবে। সেই থেকে বীরহোররা বাঁদর ও বেবুন ধরে খায়।

মুন্ডা রামকথায় অযোধ্যা একটা গ্রাম। সীতা আদিবাসী মেয়ে, খরার বছর তার জন্ম। লাঙলের ফালে তাকে পাওয়া যায়। জনক একজন চাষি। সীতা যখন ছাগল চরাচ্ছিল রাবণ তাকে হরণ করে। ঋক্‌বেদে এই সীতাই আবার শস্যের দেবী। মুন্ডারা সীতাকে মা-সীতা হিশেবেই আরাধনা করে। শবরাও সীতাকে মা মনে করে। অন্যদিকে মুন্ডারা ঋষ্যশৃঙ্গকে বাইসন-সিং মুরিয়ার সঙ্গে তুলনা করে বলতে চায় ঋষ্যশৃঙ্গ আদিবাসী পুরোহিত ছিলেন। যিনি রাম-লক্ষ্মণদের আসল পিতা ছিলেন। জীবনের শেষপর্বে তাদের তিন মা, কৈশল্যা, কৈকেয়ী ও সুমিত্রা ঋষ্যশৃঙ্গের কাছে ফিরে আসেন অযোধ্যা ত্যাগ করে। আর লেজওয়ালা বানর যাদের মনে করা হয় তারা আসলে মুন্ডাদের পূর্বপুরুষ, যারা ধুতিকে লেজের মতো করে পরত। অযোধ্যার পাশেই তারা থাকত। মুন্ডারা আজও লেজের মতো করে ধুতি পরে। বিশেষত তারা যখন নাচে তাদের ধুতি লেজের মত পড়ে।

শবরদেরও একইরকম বিশ্বাস। রামকে তারা কখনই অবতার বা ভালো মানুষ মনে করেননি; রামকে তারা সাধারণ মানুষ মনে করে। রাবণকে তারা বীর মনে করে। রাবণ মুন্ডা জনজাতির পূর্বপুরুষ। রামের সীতার প্রতি ব্যবহার তারা ভালো চোখে দেখেনি।

ভারতের আদিবাসী উপজাতিগুলি যে যার মতো নিজেদের সংস্কৃতির ছাঁচে রামায়ণ বিনির্মাণ করে নিয়েছে। বোন্ডদের রামকথায় এরকম কাহিনী আছে : রাম-লক্ষ্মণ সীতা একটা গ্রামে বাস করত। রাম রাত্রে গোপনে গ্রামে ঘুরে বেড়াত আর শুনত তাকে নিয়ে কে কি বলছে। গ্রামে এক গরিব কুমোর বাস করত। একদিন তার বউ কুমোরকে খাবার দিতে দেরি করে। তাতে কুমোর বউ-এর ওপর রেগে যায়। তখন বউটি তার রাগ ভাঙাতে বলে: ঠিক আছে, এসো, আমার বুকের দুধ খাও। কুমোর তার উত্তরে বলে, আমি রাম না যে ও ধরনের কাজ করব। রাম গৃহে ফিরে লক্ষ্মণকে বলেন: সীতাকে দূরে কোথাও রেখে এসো। লোকে আমার দুর্নাম করছে। আমি নাকি সীতার উপযুক্ত স্বামী না। লক্ষ্মণ বললেন: তা কি করে সম্ভব? সীতার পেটে বাচ্চা। রাম বললেন, তুমি যদি না নিয়ে যাও, আমিই তাকে অন্য কোথাও রেখে আসব। তখন লক্ষ্মণ কি আর করেন, সীতাকে তার বাপের বাড়ি নিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ নেয়। পথে রাজা বোদকের রাজ্য পড়ল। সেখানে তাঁরা বিশ্রাম নেওয়ার তোড়জোড় করলেন। লক্ষ্মণ যখন খাবার তৈরি করছেন, সীতা স্নানে গেলেন। সীতার দেহে কাপড় এমনভাবে জড়ানো ছিল যে তার স্তনযুগল ও স্ফীত পেট স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। মুন্ডলীপাড়ার কয়েকটি মেয়ে জল নিতে এসে সীতাকে একরকম নগ্ন অবস্থায় দেখে। তারা ভাবল সীতা নগ্ন হয়ে স্নান করছে। হাততালি দিয়ে তারা হেসে উঠল। তাদের বিস্ময় রামের মতো অতবড় রাজার বউ তাদের মতেই নগ্ন হয়ে স্নান করছে। যখন লক্ষ্মণ তাদের হাসি শুনতে পেলেন রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে অভিশাপ দিলেন : মুন্ড - লান্ডি, পেন - বান্ডি! তোমাদের ওপরটা আর নিচটা নগ্ন হয়ে যাক। মুহূর্তে তাদের মাথার চুল খসে পড়ল, তারা নেড়া হয়ে গেল। আর তাদের কোমর থেকে কাপড় খুলে গেল, তারা নগ্ন হয়ে গেল। ঝরনার ধারে একটা পাথরের আড়ালে তারা কাঁদতে লাগল, সীতা যখন সমস্ত ব্যাপারটা জানতে পারলে অনুশোচনায় তার মন ভরে গেল। সীতা তাদের কাছে ডেকে নিলেন। নিজের শাড়ির একটুকরো তাদের হাতে দিয়ে বললেন: এতে যতটুকু ঢাকা যায় দেহ ঢেকে নাও। আর যেটুকু প্রয়োজন নিজেরাই বাড়িতে বুনে নিও। বাজার থেকে যদি কাপড় কেনো তোমাদের বংশ ধ্বংস হয়ে যাবে। সবচেয়ে যা বিস্ময়ের অনেক আদিবাসী উপজাতির রাবণ, মেঘনাদ, কুম্ভকর্ণ-র প্রতি টান-ই বেশি।

পন্ডিতরা মনে করেন ভারতে ভক্তি আন্দোলনের যুগ আসার আগে পর্যন্ত রাম-লক্ষ্মণদের তুলনায় রাবণ, মেঘনাদ, কুম্ভকর্ণদের আদিবাসীরা ঋষি বা বীর জ্ঞানে ভক্তি করত। ভক্তি আন্দোলন রামকে রাবণের বিরুদ্ধে অবতার বানিয়ে দেয়। অনেক নৃতাত্ত্বিক মানব, বানর ও রাক্ষস বলতে মানবজাতিরই তিনটি গোষ্ঠীর কথা ভাবেন। তাদের সমাজব্যবস্থা, সংস্কৃতি, জীবনযাত্রা, খাবার-দাবারের অভ্যেস ইত্যাদি বিশ্লেষণ করে তাদের উৎস খোঁজেন। তাঁরা মনে করেন রাক্ষসরা উন্নত সভ্যতার মানুষ। বানররা আদিবাসী মানুষ। মানুষ ও রাক্ষসদের মধ্যে এমনকিছু তফাৎ ছিল না। দুটো সভ্যতার সংঘর্ষ হয়েছিল — যার একদিকে রাম নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, অন্যদিকে রাবণ। আর আদিবাসী বানররা রামের পক্ষ নিয়েছিলেন।

ধর্ম বিশ্বাসীদের কাছে রাম ঈশ্বরের অবতার। অর্থাৎ স্বয়ং ঈশ্বর রামের রূপ নিয়ে মর্তে এসেছিলেন। তাঁর আচার আচরণ মানুষের মতো হলেও তিনি যেসব কাজ করেন তা মহাজাগতিক, অনেক অলৌকিক কান্ড ঘটানোর ক্ষমতা রাখেন। ধর্মবিশ্বাসীরা নিজেদের কল্পনা অনুযায়ী রামকে নানাভাবে গড়ে নেন। রামকথা শুনে আনন্দ পান। আর এই রামের কথা যেসব গ্রন্থে লেখা হয়েছে ধর্মবিশ্বাসীদের কাছে তা ধর্মগ্রন্থের মতো। রামায়ণ কবির রচনা হলেও অনেকে মনে করেন রামায়ণ 'ইতিহাস'। ইতিহাসে রাম রাবণের যুদ্ধের কোন উপাদান নেই। মহাভারত লোকপরম্পরা জনশ্রুতিতে গড়ে ওঠা ইতিহাস আশ্রিত পুরাণ। রামায়ণ তা না। রামকথা একদিনে তৈরি হয়নি। ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে। ঋগ্‌বেদে রামকথার পাত্রপাত্রীর পূর্বাভাস আছে। বৈদিক সাহিত্যে সীতা আছেন। ঋক্‌বেদের একটি ঋক থেকে জানা যায় রাম লক্ষ্মণ সীতা ভাইবোন। রাম লক্ষ্মণ দুজনেই সীতাকে ভালোবাসতেন। একইসঙ্গে তাঁরা সীতার ভাই ও পতি। বৌদ্ধজাতক কাহিনীতে রামকথা পাওয়া যায়। সংস্কৃত পালি ও প্রাকৃত ভাষায় রচিত সাহিত্যেও রামকথা পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের বাইরেও রামকথা ছড়িয়ে পড়ে। পালি ও খোটানি রামকথা আছে। তিব্বতী ও সিয়ামি রামকথা আছে। পালিভাষার তিনটি জাতক কাহিনীতে রামকথা আছে। এরমধ্যে একটি ২৫১ খ্রীষ্টাব্দে ও দ্বিতীয়টি ৪৭২খ্রীষ্টাব্দে চিনে ভাষার অনুদিত হয়। প্রথমটিতে রামকে বোধিসত্ব বলা হয়। দ্বিতীয়টি রামের উল্লেখ থাকলেও সীতার উল্লেখ নেই, জৈন কবি-পন্ডিতেরাও রামকথা লিখেছেন। যেখানে রাবণ কুবেরের ভাই। কুবের থাকেন হিমালয়ে রাবণ থাকেন লঙ্কায়। রাবণ সমুদ্র নাগ। দশটি মাথা। হাইড্রাজাতীয় প্রাণী। সমুদ্রে রাবণের রাজ্য। প্রাকৃতে জৈব রামকথা পউম চরিত্র অর্থাৎ পদ্ম চরিত।এখানে সীতা রাবণ ও মন্দোদরীর কন্যা। ভবিষ্যদবাণী ছিল সীতার হাতে রাবণের বংশ ধ্বংস হবে। বৌদ্ধজাতকে রামই নায়ক। অনুমান করা হয় খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীতে ইরানি খোটানি ভাষায় রামকথা লেখা হয়েছিল। খোটানি রাম আখ্যানেও সীতার হাতে রাবণের নগরীর উচ্ছেদ হবে ভবিষ্যদ্‌বাণী ছিল। এখানেও রাম লক্ষ্মণ দুভাই সীতার প্রেমে পড়েন। এ রামকথায় দশগ্রীব বা রাবণ বুদ্ধের কাছে এসে ধর্মদেশনা নিয়েছিলেন। এ রামকথায় রাবণের মৃত্যু লুকানো ছিল পায়ের বুড়ো আঙুলে। সিয়ামকাম্বোডিয়ার রামকথায় রাবণের প্রাণভোমরা লুকানো এক মুনির কাছে কৌটায়। মুনির নাম অগ্নিচক্ষু। রাম যখন রাবণের সঙ্গে পেরে উঠেছিলেন না, রামের রাক্ষসের বন্ধু (বিভীষণ) রামকে ঐ কৌটোর সন্ধান দেন। মালয় উপদ্বীপে, মালয়দ্বীপপুঞ্জ ও ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জেও রামকথা পাওয়া গেছে। যবদ্বীপের ভাষায় এ রামকথার নাম কাকাবিন। ফিলিপিনের মারানাও ভাষার রামকথার নাম মহারাদিয়া লাওয়ানা (মহারাদিয়া—মহারাজ; লাওয়ানা--রাবণ)। এ রামকথায় রামসীতার জলকেলির ফলে পুত্র ভূমিষ্ট হয়েছিল। এ রামকথায় সোনার শিঙ হরিণ বা সোনার ছাগল মারীচ না, স্বয়ং রাবণ। মালয়দ্বীপপুঞ্জের রামকথাগুলি মুসলমানদের রচনা। অশ্বঘোষের রামকথা জাতক কাহিনী অনুসরণ করে।

কালিদাসের রামকথার বাল্মিকী চারণ-ভাট ছিলেন। কালিদাসের রামকথায় আছে সীতার উদ্বত স্তনযুগ দেখে একটি কাক ঠুকরে দেয়। সীতা ব্যথা পান। রাম রেগে একটুকরো ঘাসবাণ কাকের দিকে ছোড়েন। কাকের প্রাণ হরণ না করে তার একটা চোখ নষ্ট করে দিয়ে শাস্তি দেন। বাল্মিকী রামায়ণের আগেই কালিদাস রঘুবংশ লিখেছিলেন। সংস্কৃত সাহিত্যের সবচেয়ে প্রাচীন রামকথা ভট্টিকাব্য। এ রামকথায় উত্তরকান্ড নেই। অভিনন্দনের রামচরিত শুরু হয়েছে সীতা হরণের পর থেকে। একটি আইরিশ মিথের সঙ্গে এই রামকথার মিল আছে। কেউ কেউ মনে করেন ইরান থেকে রাম নাম এসেছে। লিথুয়ানিয়ার রূপকথায় রামকে পাওয়া গেছে। আর এ ভাবেই বিভিন্ন শতাব্দীর রাম এই আর্কিটাইপের বিনির্মাণ ঘটেছে।

কম্বন রচিত তামিল রামায়ণ রামকথাই

রামায়ণ বিশ্ব সাহিত্যের সেই বিরল মহাকাব্য বা মহাউপন্যাস যার পাঠকৃতি এবং মূল পাঠকৃতির অসংখ্য বিনির্মাণ একটি উপমহাদেশের মানুষকে জাত ধর্ম নির্বিশেষে প্রভাবিত করেছে। এই একবিংশ শতাব্দীর পোস্টমডার্ন পৃথিবীতেও রামায়ণ লেখা হচ্ছে। রামায়ণ ও মহাভারতের সমধর্মী দুই মহাকাব্য ইলিয়দ ও ওদিসির প্রভাব কিন্তু পশ্চিমি জনজীবনে এত প্রত্যক্ষভাবে নেই। রামের গল্প জানে না এরকম হিন্দু ছেলেমেয়ে খুঁজে পাওয়া কঠিন। রামায়ণ মিথ হলেও অনেক ভারতীয় রামায়ণকে আজও ইতিহাস বলে ধরে নেন এবং মহাকাব্য চিহ্নিত স্থান নিয়ে পুজো—আচ্চা—ভক্তিতে যেমন মজেন, অন্যদিকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাও বাঁধিয়ে ফেলেন। রামায়ণের উপস্থিতি ভারতীয় সমাজ জীবনে সবসময়ই অনুভূত হয়। মানুষের বিশ্বাস রাম নামে সব পাপ ধুয়ে মুছে যায়। যার ফলে দক্ষিণ ভারতের প্রায় সব ঘরে ঘরে ছেলেমেয়ের নাম রাম, সীতা রাখা হয়। উত্তর ভারতেও রাম সীতার সংখ্যা কম না। তথ্য প্রযুক্তির যে বিপ্লবই ঘটুক, দেশের আশীভাগ গ্রামীণ সংস্কৃতি রামায়ণ কেন্দ্রিক। রামের ভাই লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্নও ভারতীয়দের প্রিয়। নবম শতকে তৈরি দক্ষিণ ভারতের বেশ কিছু বিখ্যাত মন্দিরও রামের নামে। অন্য দিকে উত্তরভারতে রামভক্ত হনুমানের পুজো যেমন জনপ্রিয় দক্ষিণ ভারতে রাবণ তেমনি পুজিত। ভারত শ্রীলঙ্কার মধ্যে রামসেতু নিয়ে ভারতীয় রাজনীতিতে বির্তক আজও অব্যাহত। রামসেতু নির্মাণ একটি রাজনৈতিক দলের কর্মসূচিতেও স্থান পায় এবং তা নিয়ে সারা দেশ জুড়ে টেলিভিশন বির্তক চলে। কি দক্ষিণ ভারতের কি উত্তর ভারতের নানা শিল্প-স্থাপত্য-চিত্রকলাতেও রামায়ণের কাহিনী বর্ণিত। ভক্তিমার্গের যুগে মন্দির সংস্কৃতিতে দেবতাকে মানবোপম মানুষে রূপান্তরিত করে নেবার প্রবণতা প্রাধান্য পায়। উত্তর-উপনিষদ যুগে দক্ষিণ ভারত থেকে উত্তরভারতে এই সংস্কৃতি প্রবাহিত হয়। বেদের যুগের দেবতারা যেমন ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি, এমনকি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ধীরে ধীরে প্রান্তিক দেবতায় পরিণত হন। হিন্দু ভক্তি আন্দোলনে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবের নানা অবতার হিন্দু ধর্ম বিশ্বাসে চলে আসেন। বিমূর্ত দেবতার স্থান নিতে থাকেন মানবরূপী দেবতারা, যারা স্বর্গ থেকে মর্ত্যে নেমে আসেন পাপী তাপী মানুষকে উদ্ধার করতে। দেবতারা দেখতেও মানুষের মতো, তাঁদের কাজকর্মও মানুষের মতো। তা নাহলে ভক্তি আসবে কী করে? ভগবত গীতায় আছে যখন ধর্মে অবক্ষয় নেমে আসে অন্যায়কারীকে শাস্তি দিয়ে ধ্বংস করার জন্য ঈশ্বর পৃথিবীতে নেমে আসেন। বিষ্ণুর দশাবতার বিবর্তনের মধ্যে অনেকে পারমাণবিক ধ্বংসের ভবিষ্যত ছবি দেখতে পান। এই বিষ্ণুই—নারায়ণ এবং মানবোপম রাম। রাম ষষ্ঠ অবতার। বিবর্তনে পরের অবতার কৃষ্ণ, তারপর কলি, তারও পরে কল্কি। কল্কি যুগ এখনো আসেনি। ঘোর কলি যুগ চলেছে। অন্যদিকে সত্য—ত্রেতা—দ্বাপর—কলির মধ্যে রাম এসেছিলেন সত্য যুগে, যে যুগে সব মানুষেরা সত্যি কথা বলত, সত্যি কথা বলতে ভালোবাসত।

নব্য-হিন্দু ধর্মে যে ভক্তি আন্দোলন দেখা দেয় তার প্রভাব পড়ে ভারতীয় সমাজ জীবনে। ভক্তি সাহিত্য নতুন ঈশ্বরতত্ত্বে জনপ্রিয়তার নতুন ডিসকোর্স তৈরি করেন লেখকরা,

যা ভক্তি আন্দোলনকে মানুষের অনেক কাছের করে করে তোলে। ঈশ্বর আর দূরের বস্তু রইলেন না, তাঁকে কাছে পাওয়া যায়। সর্ব ধর্মের প্রতি সমান শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রদর্শন করার জন্য যে আবেগ প্রধান কবিতা রচিত হল সেখানে গোঁড়া হিন্দু ধর্মের জাতপাতের বিভেদ ধুয়েমুছে সাফ হয়ে গেল। অস্পৃশ্যরাও দেবতাকে আবেগ ভরে ডাকলে স্পর্শ করতে পারেন। রামের বন্ধু হনুমান, সুগ্রীব হতে পারেন, বিভীষণও হতে পারেন। রামায়ণের সাথে সাথে রামায়ণের চরিত্রগুলির নানা ভাবে বিনির্মাণ বা ডিকনস্ট্রাকশন ঘটে চলল। স্থানিক বিশ্বাস ও ভক্তি অনুযায়ী নতুন নতুন রামকথা লেখা হতে লাগল—যেখানে প্রাধান্য পেল স্থানীয় রীতিনীতি, আচার ব্যবহার, মূল্যবোধ। তখন তো আর বই মুদ্রিত হত না। হাতে গোনা তালপাতার পুঁথিপত্রে রামকথা লেখা হত। বেশির ভাগ রামায়ণই মুখ-ফেরতা সাহিত্য, লোকের মুখে মুখে ফিরত, স্মৃতি যেটুকু ধরে রাখতে পারত, সেটুকুই ধরে রাখা হত। বেশিরভাগ মানুষই নিরক্ষর। স্মৃতিশক্তি যাদের ভালো রামকথা স্মৃতিতে নিয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরত, এরকম রামকথা বলিয়েদের শৈশবে আমিও গ্রামে-ঘরে দেখেছি—যদিও আমরা মুদ্রিত বইয়ের যুগে বাস করি। এখনতো তথ্য-প্রযুক্তির যুগ, রামকথা শুধু চলচ্চিত্রে দেখানো হচ্ছে না, ডিজিটাল প্রিন্টেও দেখানো হচ্ছে, অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমেও দেখানো হচ্ছে। কিন্তু তখন রামকথা আবৃত্তি করে বা গান গেয়ে শোনানো ছাড়া অন্য কোন উপায় ছিল না। রামকথার মধ্যেই মানুষ জীবনদর্শন খুঁজে নিত, রাম কথার মধ্যেই মানুষ শিক্ষিত হয়ে উঠত। মন্দির বা কোন গ্রামের মিলন স্থলে শত শত সমবেত মানুষ রামকথা শুনে আন্দোলিত হত। রোমাঞ্চ অনুভব করত। রামকথার মধ্য দিয়ে শত শত মানুষ তার বিবেক বোধকে শুদ্ধ রেখেছে। মানবিক গুণ সজাগ রেখেছে, রামের মতো সত্যের সাধক হওয়ার চেষ্টা করেছে, অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে লড়াই করার প্রেরণা পেয়েছে। রামায়ণের মাধ্যমে শত শত বছর লোকায়ত সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়েছে। কি দক্ষিণভারতীয় কি উত্তর ভারতীয় সংগীত সমৃদ্ধ হয়েছে। উচ্চমার্গের কর্ণাটকি সংগীতও তো রামায়ণ সম্পৃক্ত। তামিল জীবনে এই সংগীতের প্রভাব অপরিসীম। অন্যদিকে মধ্যভারত ও উত্তরভারতে রামায়ণী গানের প্রভাবে দক্ষিণভারতের ঘরে ঘরে রামসীতার ছবি। কোন বহুজাতিক কোম্পানি রাম সীতার ছবি ও গানের বিশ্বায়ন করতে পারে। ধর্মীয় অনুষঙ্গ থাকায় তার প্রভাবও হবে মারাত্মক। তানজোর পেইন্টিং-এও রামায়ণের কাহিনীর চিত্ররূপ থাকে। বিশেষভাবে রাবণ বধ করে বনবাস থেকে ফিরে আসা রামের অযোধ্যায় অভিষেকের ছবি। আমাদের বাঙালী জীবনে যেমন রবীন্দ্রসংগীত, দক্ষিণভারতের ঘরে ঘরে কর্ণাটকি সংগীতের একই রকম প্রভাব, বিশেষত রামের বন্দনা গান। দক্ষিণ ভারতীয়দের দৈনন্দিন জীবনে আজও রাম শয়নে-স্বপ্নে-জাগরণে। হিন্দু ধর্মে যত বর্ণ বা উচ্চনীচ জাতিভেদ প্রথা থাকুক রামায়ণে সবার সমান অধিকার। 'অস্পৃশ্য' বলে পরিচিতদের এক অংশ বাল্মিকীকে তাদের পূর্ব-পুরুষ মনে করেন। মধ্য ভারতের ছত্রিশগড়ে একদল নিম্নবর্গের মানুষ নিজেদের রামনামিস বলে পরিচিতি দেন এবং তাদের কবিতা ও গানে তুলসীদাসের রামচরিত মানস-এর খন্ডকাহিনী প্রাধান্য পায়। ভারতীয় মুখফেরতা সাহিত্য মহাসাগরের মতো সমৃদ্ধ—আর তার অনেকখানি অংশ জুড়ে রামকথা। উত্তরভারতে পথ নাটক রামলীলার মতোই দক্ষিণ ভারতে পথ নাটক থেরুকুট্টু। স্থানীয় পরিবেশ,

পরিস্থিতি ও প্রথা অনুযায়ী এগুলি রচিত হয়। ফলে একই রামায়ণের নানা বৈচিত্র নানা ফর্ম ভারতের নানা প্রান্তে। আমাদের যদি প্রশ্ন করা হয় ভারতীয় সাহিত্য কি? এক কথায় উত্তর হল: রামায়ণ ও মহাভারত।

উত্তর ভারতে রামভক্তির প্রাবল্য, রামের সব কাজ অনুমোদিত। দক্ষিণ ভারতে কিন্তু তা না। সেখানে রামের সব কাজের প্রতি তাদের সমর্থন নেই। অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটকে সীতায়ন আছে। সীতার চোখ দিয়ে যেখানে সব কিছুর বিচার বিশ্লেষণ হচ্ছে। অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ুতে রাবণও এক মহৎ চরিত্র। বাংলা ভাষার মাইকেল মধুসূদন দত্ত-র 'মেঘনাদ বধ কাব্য'ও রামায়ণের ডিকনস্ট্রাকশন এবং সেখানে মেঘনাদ ও রাবণকে মহিমান্বিত করা হয়েছে—যদিও আদি রামায়ণের মূল কাহিনীর কোন বিকৃতি ঘটানো হয়নি। রামায়ণের ডিকনস্ট্রাকশন সেখানে রাবণের প্রতি সহানুভূতিতে সম্পৃক্ত। বিভিন্ন ভারতীয় লোক গাথায় রাবণের ঔরসে সীতা যেমন জন্ম নেয়, মন্দোদরীর গর্ভেও সীতা জন্ম নেয়। এমন রামায়ণও আছে যেখানে সীতা বা লক্ষ্মণ রাবণকে বধ করে। ভারতীয় মানসে রামের উপস্থিতি নিয়ে মন সমীক্ষা করা চলে। প্রায় প্রতিটি ভারতীয়র চেতন বা অবচেতন মনে রাম সীতা। আজ যেমন, ভবিষ্যতে রামায়ণ ও রামায়ণের চরিত্রগুলির অগণন বিনির্মাণ চলবে—যা এককালে রামচরিত মানসের স্রষ্টা তুলসী দাসও বলেছিলেন: রামকথা কাই মিটি জাগা নাহি (পৃথিবীতে এত অসংখ্য রামকথা আছে গুণে শেষ করা যাবে না)। আমাদের বাংলা ভাষাতেও ইতিমধ্যেই একগুচ্ছ রামায়ণ বা রামকথা লেখা হয়েছে। বাংলা লোকসাহিত্যকে রামায়ণ সমৃদ্ধ করেছে। আর রামায়ণ থেকে রস গ্রহণ করেছে হিন্দু-মুসলিম উভয়েই। পৃথিবীতে কত রামায়ণ আছে? তার কোন সঠিক হিসেবে নেই। কেউ বলেন৩০০, কেউ বলেন১০০০এর বেশি। এই ১০০০রামায়ণের কথা যাঁরা বলেন তাঁরা মুখ-ফেরতা রামায়ণের কথা ধরেই বলেন এবং রামকে কেন্দ্র করে নানা ভাষায় যেসব কাহিনী আছে সেসব গণ্য করেন। বাল্মিকী রামায়ণ ছাড়া যেকটি রামায়ণ বিখ্যাত তাহল উত্তরভারতে তুলসী দাসের রামচরিত মানস, দক্ষিণ ভারতে মালায়ালাম ভাষায় টুনকাট্টু এঝুউচান রচিত অদ্ধাত্মা রামায়ণ ও দক্ষিণ ভারতের তামিল ভাষায় রচিত কম্ব রামায়ণ। দ্বাদশ শতকে চোল সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় পর্বে মন্দিরের ঢাকবাদকের পুত্র কম্বন, *রামকথাই* রচনা করেন। আদি কবি বাল্মিকীর সংস্কৃত রামায়ণের বিনির্মাণ বা ডিকনস্ট্রাকশন এই রামায়ণ। কেন না, তামিল ভাষায় তিনি একটি স্বতন্ত্র রামায়ণ রচনা করেন। সংস্কৃত ও তামিল—দুটো ভাষাতেই কম্বনের বুৎপত্তি ছিল। বিভিন্ন সূত্র থেকে কম্বন রামায়ণ রচনা করেন। পন্ডিতদের অনুমান এই রামায়ণ নবম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে রচিত হলেও—সমসাময়িক সমাজের ধর্ম, দর্শন, ঈশ্বরতত্ত্ব সাহিত্য ও আঞ্চলিক সংস্কৃতির প্রভাব দেখে চোল সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় পর্ব অর্থাৎ দ্বাদশ শতকেই কম্ব রামায়ণ বা রামকথাই রচিত মনে করা হয়। কম্বন স্বশিক্ষিত ছিলেন। আদি কবি বাল্মিকীর রামায়ণ ছাড়াও কালিদাসের রঘুবংশ-এর পাঠ তাঁর ছিল। রঘুবংশে অভিশাপে অহল্যা পাথর হয়ে ছিল, রামের গানে সে যেমন জীবন ফিরে পায়। কম্বনের রামায়ণের একই ভাবে অহল্যা কাহিনী আছে—এই কাহিনীর সঙ্গে বাল্মিকী রচিত রামায়ণের অহল্যা কাহিনীর পার্থক্য আছে। থাইল্যান্ডের রামায়ণ রামকিয়েনএ—কম্বনের কাহিনীর অনুরূপ অহল্যা কাহিনী আছে।

বাল্মিকী রামায়ণের ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি থাইল্যান্ডের কলাইকোন্টু, কম্বনের রামায়ণ থেকে নেওয়া চরিত্র। যীশুর জন্মের একশ বছর আগে তামিল কবিতার সঙ্গমযুগে রামকথা পরিচিত ছিল। এই সঙ্গমযুগ যীশুর জন্মের পর, আরো চার শতক প্রবাহমান ছিল। বৈষ্ণব ও শৈব সাধকদের রহস্যময় কবিতাতেও রামকথা ছিল। যুদ্ধ ও বীরগাথার শৌর্য নিয়ে সঙ্গম যুগের কবিতা সংগ্রহ *পুরানানুরু*তে সীতা ও বাঁদরদের কথা আছে। ভালোবাসার কবিতা সংগ্রহ *আকা নানুরু*তেও রামের কথা আছে। যেখানে লঙ্কা আক্রমণের আগে রাম তাঁর পারিষদবর্গের সঙ্গে সীতা উদ্ধারের আলোচনায় বসেছেন। তামিল সঙ্গমযুগের একজন বিখ্যাত কবির নাম বাল্মিকী। নবম শতকে নাদমুনি সংকলিত *নাল্লেইরা দিব্য প্রবন্দন*-এর প্রায় চার হাজার স্তোত্রের মধ্যে রামায়ণের অনেক কাহিনী ও চরিত্র আছে।

কম্বনের রামায়ণে এই সব কাহিনীর সমাবেশ ঘটেছে। তামিল সাহিত্যের ঐতিহ্য উত্তর ভারতের সংস্কৃত সাহিত্যের ঐতিহ্য থেকে অনেক আলাদা। যীশুর জন্মের দুশ বছর আগের ও দুশ বছর পরের--মোট চারশ বছরের সঙ্গম সাহিত্যের ঐশ্বর্য ভাড়ার আয়তনে অনেক বড়। পানিণির সংস্কৃত ব্যাকরণের মতোই প্রায় একই সময়ে তামিলদের উল্লেখযোগ্য ব্যাকরণ ছিল *থোলকাপ্পিউম*--যার তিনটি ভাগ হল *এবুট্টু, কোল* ও *পোরুল*। এবুট্টু হল ফোনোলজি বা ধ্বনিবিজ্ঞান। কোল--শব্দ ও বাক্য গঠন প্রণালী। পোরুল--অর্থ বা কাব্য সমালোচনা বিদ্যা। এই *থোলকাপ্পিউম*-এ কবিতা লেখার (বিষয় ও ফর্ম) চৌত্রিশ রকম উপাদান আছে। বাক্যের গঠন ও ছন্দের ছ'রকম ফর্ম আছে ভিন্ন রূপ নিয়ে। থোলকাপ্পিউম প্রধান দুটি ভাগ অহম্ ও পুরম্। অহম্—এ প্রাধান্য পায় ভালোবাসার ব্যাপার আর পুরম্-এ ভালোবাসা ছাড়া মানব জীবনের অন্যান্য ব্যাপার—যেমন যুদ্ধ ও জীবনের অন্যান্য প্রসঙ্গ। বিশেষ ধরনের কাজের জন্য বিশেষ ধরনের ফর্ম ও ছন্দ তামিল কবিতার ঐতিহ্য ছিল। ঘটনাস্থল অনুযায়ী কবিতার বর্ণনা হবে, ছন্দ ও ফর্ম প্রয়োগ করা হবে। প্রধানত পাঁচটি স্থানের দৃশ্য প্রধান্য পায়--জঙ্গল, পাহাড়ী পথ বা উপত্যকা, মাঠ-ঘাট, সমুদ্র সৈকত, মরুঅঞ্চল। ভালোবাসা দু'রকম--*কালাভু* ও *কারপু*। কালাভু হল গোপন বা অবৈধ প্রেম আর কারপু হল বিবাহিত বা সতীত্ব প্রেম। এই সব ভালোবাসার আবার নানা রস বা ভাব তামিল সাহিত্যের ঐতিহ্য—যা কম্বন উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়ে ছিলেন এবং তাঁর রচিত রামায়ণে প্রয়োগ করেছিলেন। কম্বনের সময় তামিল কবিতার বাইরে থেকেও নানাস্রোতে আসতে শুরু করেছিল। বিশেষত সংস্কৃত সাহিত্য থেকে। সঙ্গম যুগের লিরিক কবিতা আর আঝওয়ারদের ভক্তিমূলক কবিতা ক্রমশ দীর্ঘ কবিতার রূপ নিচ্ছিল। এই সময়ের মহাকাব্য ধর্মী পাঁচটি ক্লাসিকস হল *শিলাপাডিকরম, মানিমেকালি, জিভাকা চিন্তামণি, ভালাইয়াপতি* ও *কুন্দনাকেশীযা* জৈন ও বৌদ্ধ কবিরা লেখেন। আর *টিরুকুরালনীতি* কবিতারমালা তামিল সাহিত্যের জগৎটাই বদলে দেয়। তামিল সাহিত্যের এই সমৃদ্ধির সমান্তরাল পল্লব ও চোল রাজা ও সম্রাটদের যুগের রাজনীতি ও সামজিক আবহ কম্বনের স্বতন্ত্র এক রামায়ণ লেখার ব্যাপারে সাহায্যে করে। বাল্মিকীর রামায়ণের বিনির্মাণ এই রামায়ণ অন্য এক রামায়ণ। পল্লব ও চোলরাজদের সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব, নিজেদের রাজ্যসীমা প্রসারিত করার অভিপ্রায় কম্বনের রামায়ণে প্রতিফলিত। দর্শন ও ধর্মতত্ত্বের দিক থেকে সমাজে ভীত গেড়ে বসা প্রথাগত ধর্ম বিশ্বাস ও

পূজাপদ্ধতিতে পরিবর্তন আনছিল ভক্তি আন্দোলন। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মেরও অনুপ্রবেশ ঘটছিল তামিল দেশে। একই রাজবংশের একেকজনে রাজা একেক ধর্মের অনুগামী হচ্ছিলেন নিজের নিজের সময়। তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতা তামিল সমাজ জীবনে পরিবর্তন আনছিল। বিভিন্ন ধর্ম নিয়ে বির্তক তুঙ্গে ছিল। সমাজের এক এক শ্রেণী নিজেদের অন্যদের থেকে উচ্চতর শ্রেণীর ভাবত, বিশেষত *আঝওয়ারর* ও *নায়ানমারদের* ভক্তিগানে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। কম্বন নিজেও ছিলেন অহিংস নগ্ন-সম্প্রদায়ের মানুষ। আঝ্ওয়াররা অহম কবিতা অনুগামী ছিলেন। কম্বন নিজেও রামায়ণের বর্ণনায় *টিনাই টাইপোলজি* ব্যবহার করেন।

রামায়ণ কি? এক কথায় মানব জীবনে ভালোবাসা কেন্দ্রিক যুদ্ধের কাহিনী। যা আমাদের শুভ ও অশুভর লড়াইয়ের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। রামায়ণকে বীরগাথাও বলা হয়। যদিও এই বীরত্বে নায়করা অনেক সময় বীরত্বের চেয়ে ছলনার আশ্রয় নেন বেশি। ইলিয়াদ-এর সঙ্গে রামায়ণের অনেক সাদৃশ্য আছে। মেনেলাউস-এর স্ত্রী হেলেনকে রাবণের মতোই ট্রয়ের রাজা প্রায়মের পুত্র প্যারিস ট্রয় থেকে চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল। যার ফলে গ্রিক ও ট্রোজানদের মধ্যে যুদ্ধ। সীতার খোঁজে রামের অন্বেষণের সঙ্গে ওদেসিউসের ভ্রমণের মিল আছে। ওদেসিউসের স্ত্রী পেনিলোপের প্রণয়প্রার্থী অনেক। রাবণের লঙ্কায় সীতার মতোই পেনিলোপ তাদের নানা ভাবে ঠেকিয়ে রাখে ওদেসিউসের ফিরে আসার প্রতীক্ষায়! ইংরেজী মহাকাব্য বেউলফ-এর সঙ্গেও রামায়ণের মিল আছে। প্রাচীন ও মধ্যযুগে বীরগাথা কবিতার অভাব ছিল না—যার অনেকগুলির সঙ্গে রামায়ণের আংশিক মিল আছে। রামায়ণ আসলে আর্কোটাইপ। বাল্মিকী রামায়ণ থেকে কম্ব-রামায়ণ রচিত হলেও দুই রামায়ণের মধ্যে মেজাজ, গঠন, প্রণালী, চরিত্রায়ণ, প্রায় প্রতিটি কান্ডের কথোপকথনের মধ্যে রীতিমত অমিল আছে। বাল্মিকীর সময়ের আর কম্বনের সময়ের ভারতবর্ষে অনেক পরিবর্তন ঘটে গেছে। সেই প্রাচীন পরিবেশে যেমন নেই, সংস্কৃতের সেই শৈশবে অবস্থা নেই। কাব্য প্রকরণ ও রীতিতেও অনেক পরিবর্তন ঘটে গেছে। বাল্মিকী সমগ্র রামায়ণ অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচনা করেছেন, শেষ ব্যক্তিগত সর্গ ছাড়া। কম্বন তামিল কবিতার তিন ধরনের ছন্দ—কালি, ভিরুওম ও তুরাই-এর নব্বই রকম ভাষারীতি প্রয়োগ করেছেন। বাল্মিকী কম্বনের মতো সমৃদ্ধ সাহিত্যের অভিজ্ঞতা পাননি। কম্বন তাঁর সময়ের নানা কাহিনী ও মিথ থেকে উপাদান সংগ্রহ করেছেন। শব্দের প্রয়োগ ও বাক্য গঠনে কম্বনের রীতিমত দক্ষতা ছিল। বাল্মিকী রামায়ণের সরলতা ও সংযত ভাব কম্বনের রামায়ণে নেই। কম্বনের রামায়ণ আড়ম্বরতায় পরিপূর্ণ। কম্বনের সময় কবিতার ফর্মও অনেক বদলে গেছে। বীর গাথার মহাকাব্য ধারা সুপ্রতিষ্ঠিত। বাল্মিকী রামায়ণের রামকে নরোত্তম বা মানবশ্রেষ্ঠ মানুষ বলা হলেও তিনি শুধুই মানুষ। মানুষের সমস্ত গুণ তাঁর মধ্যে (দোষ-ও)। কম্বন যখন রামকথাই রচনা করেছেন রাম ততদিনে ভক্তির আতিশর্যে দেবতায় রূপান্তরিত। রামের মধ্যে অনেক দৈবগুণ আরোপিত হয়ে গেছে। যা এই আধুনিক কাল বা একবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত অব্যাহত। বাল্মিকী রামায়ণের বালকান্ডে বিষ্ণুর মর্ত্যে রামরূপে অবতরণের কথা বলা হয়েছে। দেবতাদের অনুরোধে ব্রহ্মার কথায় রাবণকে বধ করার জন্য রাম মর্ত্যে এসেছেন। কম্বন রামায়ণের

পাঠকৃতি আধুনিক ম্যাজিক রিয়ালিজম উপন্যাসের মতো—কারণ, কম্ব-রামায়ণে রাম (বিষ্ণু) ও সীতা (লক্ষ্মী) প্রথম দর্শনেই প্রেমে পড়েন। এরকম ঘটনা বাল্মিকী রামায়ণে নেই। কম্ব-রামায়ণ বীররসের রামায়ণ হলেও সীতার অপহরণ ও রাবণের শক্তিশেলে লক্ষ্মণের মৃত্যুর সময় রাম বিচলিত, শোকার্ত, বিলাপ করছেন, রামের মানব গুণ প্রকাশ পেয়েছে। বাকি সবক্ষেত্রে রাম দেবতাদের মতো নিখুঁত, নিটোল। কম্বনের রামায়ণের রাম স্থিতপ্রজ্ঞা। দশরথ যখন রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করার জন্য মুকুট পরিয়ে দিচ্ছেন, রাম সন্দীপ্ত নন। কৈকেয়ী যখন তাঁকে রাজমুকুট ত্যাগ করে বনবাসে যেতে বলছেন তখনও তিনি হতাশ নন। নরোত্তম শ্রেষ্ঠ হলেও একজন মানুষ হিসেবে রামের এসবে বিচলিত ও শোকাহত হওয়ার কথা, কিন্তু তা তিনি হন নি। বাল্মিকী রামায়ণের রাম আর পাঁচজন মানুষের মতোই রাজমুকুট পেয়ে আনন্দিত, লক্ষ্মণের সঙ্গে সেই আনন্দ ভাগ করে নিচ্ছেন। এরকমই হওয়ার কথা। এটাই মানবিক। কম্বন রামায়ণে রামের মধ্যে এরকম বিপর্যয়ে কোন রকম আবেগের প্রকাশ নেই, সব কিছুই তাঁর কাছে কর্তব্যবোধ। বাল্মিকী রামায়ণে কৈকেয়ীর প্রস্তাবে রাম বিচলিত, কৈকেয়ীর প্রতি উষ্মা প্রকাশ করছেন, সীতার সঙ্গে রামের আসন্ন বিচ্ছেদে (যদিও তা ঘটেনি,সীতা রামের সঙ্গে বনবাসে গিয়েছিলেন, লক্ষ্মণও) কৈকেয়ী যে উল্লসিত হবে বলছেন। কৌশল্যা যেখানে সন্তানের বেদনায় বিলাপ করছেন, কৈকেয়ীর আনন্দ নিজের ছেলে ভরত রাজা হবে। কম্বন রামায়ণে কৈকেয়ীর প্রতি রামের বিদ্বেষ নেই, বরং লক্ষ্মণ ও ভরত কৈকেয়ীকে তিরস্কার করলে, তিরস্কার করা থেকে তাদের বিরত থাকতে বলছেন। সমগ্র কম্বন রামায়ণে রামের মতো ভালো আর কেউ না। রাম ভালোর প্রতিমূর্তি। রামের চরিত্র বৈশিষ্ট্যই হল ভালো হওয়া, ভালো করা। সীতাকে বিয়ে করা, অহল্যার শাপমুক্তি দেওয়া, সীতার সতীত্বের অগ্নি পরীক্ষা—সর্বত্রই রাম ভালো। অবশ্য নিজের ভালোত্ব সম্বন্ধে রামের কোন ধারণা ছিল না। যদিও সীতার এই অগ্নিপরীক্ষা আমাদের বলে দেয় সীতা পরপুরুষ রাবণের ঘরে থাকায়, তাঁর সতীত্ব নিয়ে রামের ঈর্ষা ছিল। তা নাহলে ব্রহ্মাকে কেন তাঁর ও সীতার পূর্ব পরিচয় দিতে হল। বাল্মিকী রামায়ণ থেকে কম্বন বহু ক্ষেত্রেই এভাবে সরে এসে নিজস্ব রামায়ণের পাঠকৃতি রচনা করেছেন। বাল্মিকী রামায়ণের বিনির্মাণ কম্বন রচিত রামকথাই। বাল্মিকী রামায়ণে সূর্পনখা রাক্ষসী। কম্বন রামায়ণে রাক্ষসীর রূপ বদলে সে সুন্দরী নারী। তার ধারণা হয়েছিল সীতার চেয়ে সুন্দরী রূপ ধরলে মানব চরিত্র অনুযায়ী রাম তার প্রতি আকৃষ্ট হবে। কম্বন রামায়ণে যুদ্ধক্ষেত্রে কুম্ভকর্ণ ও বিভীষণ মুখোমুখি হলে, বিভীষণ বড়ভাইকে বলছে রাবণের পক্ষ ত্যাগ করে রামের দিকে চলে আসতে। এরকম ঘটনা বাল্মিকী রামায়ণে নেই। এ দৃশ্য নাটকীয়, একজনের নৈতিকতার বোধ অন্যজন বিশ্বস্ততার বোধ দিয়ে খারিজ করে দিয়েছে। আশ্রয় দাতার বিপদের দিনে তাকে ছেড়ে যেতে কুম্বকর্ণের নৈতিকতায় বেধেছে। বাল্মিকী রামায়ণের অহল্যা প্রথম থেকেই জানত ইন্দ্র-ই ছদ্মবেশে অহল্যাকে ধর্ষণ করছে। উপগত হওয়ার অর্ধপথে মনে পাপবোধ বা অপরাধবোধ জাগে। কিন্তু অভূতপূর্ব যৌনমিলনের তৃপ্তিতে সে যে আনন্দ পায় তা তাকে আবিষ্ট রাখে। ইচ্ছে করেই ইন্দ্রকে সে কোন বাধা দেয়নি। নিষ্পাপ অহল্যা এক্ষেত্রে ইন্দ্রের প্রতারণার শিকার বাল্মিকী রামায়ণে। ঋষি গৌতম সবকিছু বুঝতে পেরে ইন্দ্রকে

অভিশাপ দেন তার জননকোষ খসে পড়বে। আর অহল্যাকে অভিশাপ দেন সহস্র বছর পাথর হয়ে ঘুমিয়ে থাকতে হবে যতদিন না রাম এসে তাকে স্পর্শ করে জীবন ফিরিয়ে দেন। কম্ব রামায়ণে ঋষিকে দেখে ভয় পেয়ে ইন্দ্র বিড়ালের রূপ ধরে পালাতে চেষ্টা করে। কিন্তু ঋষির অভিশাপে তার শরীরে সহস্র যোনির উদ্ভব হয়—পরে যা সহস্র চোখে পরিণত হয় (ঋষি ক্ষমা করলে)। আর অহল্যার অনিয়ন্ত্রিত লিবিডোর জন্য ঋষি তাকে অনুভূতিহীন পাথর করে দেন। পরে অহল্যার কাতর মিনতিতে তিনি অভিশাপটা একটু বদলে দিয়ে বলেন, অহল্যা আগের রূপ ফিরে পাবে যদি রামের স্পর্শ পান। বাল্মিকী রামায়ণে এরকম ঘটনা নেই। এরকম ঘটনার উল্লেখ পরে অন্যান্য রামায়ণে যে পাওয়া যায়, তার উৎস কম্বন-এর রামায়ণ। বাল্মিকী রামায়ণের রামে কম্বন অর্ধ দেবত্ব আরোপ করেছেন, পরে ষোল শতকে তুলসীদাস *রামচরিত মানসে* রামের ওপর সম্পূর্ণ দেবত্ব আরোপ করে, রামকে দেবতা বানানোর ষোলকলা পূর্ণ করেন। কৌম রাম মানুষ ছিলেন, আধুনিক রাম বির্বতনের পথে দেবতা হয়ে গেলেন, পুজো পাওয়া স্বাভাবিক। রামের প্রতি শ্রদ্ধার বদলে এলো ভক্তি। কম্বন রামের ওপর দেবত্ব আরোপ করলেও, রাম সে ব্যাপার সচেতন ছিলেন না। রামের দৈব গুণের কথা কম্বন রামায়ণের অন্যান্য চরিত্রের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন। বাল্মিকী রামায়ণে মায়া-হরিণের পেছনে ছুটতে ছুটতে রাম যখন দিশেহারা, হরিণ-রূপী মায়াবী—মারীচ রামের স্বর নকল করে লক্ষ্মণকে ডাকতে থাকেন। লক্ষ্মণ বুঝতে পারেন, ঐ স্বর রামের না, কিন্তু সীতা লক্ষ্মণকে তীব্র ভৎর্সনা করেন! এরকম কথাও বলেন, রামের বিপদ হলে সীতাকে নিয়ে লক্ষ্মণের অন্য কোন অভিসন্ধি আছে। যার ফলে লক্ষ্মণও মায়া হরিণের স্বর লক্ষ্য করে সীতাকে ছেড়ে চলে যান। রামকথাই-এ কম্বন সীতাকে দিয়ে এরকম কোন কর্কশ মন্তব্য করান নি। বাল্মিকী রামায়ণে বালীকে অন্যায় ভাবে বধে রামের যুক্তি--বালি যেহেতু বানর অতএব সে পশু, পশুকে মানুষ যেভাবেই হোক শিকার করতে পারে। কম্বনের রামায়ণে এরকম যুক্তি নেই। রাবণের সীতা হরণ দৃশ্য ও বাল্মিকী রামায়ণ ও কম্বনের রামায়ণের মধ্যে পার্থক্য আছে। বাল্মিকী রামায়ণে রাবণ ভিখিরির ছদ্মবেশে এসে সীতাকে বলপূর্বক হরণ করেন। সে ক্ষেত্রে সীতার সঙ্গে রাবণের শারীরিক ধস্তাধস্তি হওয়া স্বাভাবিক। বাল্মিকীর সময় এ-ধরনের বর্ণনা সমাজে সহজ ছিল,কম্বনের সময় ছিল না। তাছাড়া কম্বন সীতার সতীত্ব রক্ষা প্রকল্পে এমন বর্ণনা দিলেন যাতে রাবণ সীতাকে হরণ করলেও সীতাকে স্পর্শ না করতে পারেন। রাবণের ওপর নাকি অভিশাপ ছিল তিনি যদি কোন অনিচ্ছুক নারীকে বলপূর্বক হরণ করেন, তাঁর মুন্ডু উড়ে যাবে। এজন্য রাবণ সীতার পর্ণ কুটিরের নিচে গর্ত করে পর্ণকুটির সমেত সীতাকে উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। পরে ষোল শতকে তুলসীদাস এসে সীতার সতীত্বে আরো রাশ টানলেন। যা অকল্পনীয়। মেনে নেওয়া যায় না। তুলসীদাস বললেন, যে সীতাকে রাবণ হরণ করেন তিনি আসল সীতা ছিলেন না। তিনি মায়া-সীতা ছিলেন। রামায়ণের বিনির্মাণে মায়া সীতা তুলসী দাসের আবিষ্কার। সোনার মায়া মৃগের পেছনে যাওয়ার আগে রাম ইন্দ্রজালে মায়া-সীতা নির্মাণ করে যান, রাবণ এই মায়া-সীতাকে হরণ করেন ও লঙ্কায় নিয়ে যান। বাল্মিকী রামায়ণে বা কম্বনের রামায়ণে রাম ইন্দ্রজাল জানেন এরকম কোন কথা নেই। একমাত্র রাক্ষস ও বানরদের সে

ক্ষমতা ছিল—অর্থাৎ সমাজের নিম্নবর্গের মানুষদের সম্বন্ধে যে ধারণা আজও এই একবিংশ শতাব্দীতেও প্রচলিত। তুলসীদাসী রামায়ণে মায়া-সীতা অগ্নিতে প্রবেশ করে। আসল সীতা, যিনি লুকিয়ে ছিলেন, অগ্নি থেকে বেরিয়ে আসেন। মায়া ও বাস্তব—তুলসী দাসের রামায়ণে ম্যাজিক রিয়ালিজম।

বাল্মিকী ও কম্বন রচিত রামায়ণের পাঠকৃতিতেও অনেক পার্থক্য আছে। কম্বন আত্মসচেতন ভাবেই একজন কবি, ফলে তাঁর বর্ণনা আবেগ সম্পৃক্ত। তামিল কবিতার, বিশেষত মহাকাব্যের ঐতিহ্য অনুযায়ী কম্বনের রামায়ণে স্থানিক-সৌন্দর্য বেশ বড় ক্যানভ্যাসে বর্ণিত হয়েছে, মাঠ-ঘাট, নদ-নদী, গ্রাম-শহর। স্থান বর্ণনার পরেই কম্বন মূল কাহিনীতে প্রবেশ করেছেন। পথ যাত্রার বর্ণনাতেও কম্বনের কাজ অনেক পুঙ্খনাপুঙ্খ—যা বাল্মিকী রামায়ণে পাওয়া যায় না। অযোধ্যা থেকে মিথিলা রামের বিয়েতে রাজা দশরথ যে শোভাযাত্রা নিয়ে মাঠঘাট—নদী—পর্বত গ্রাম—গ্রামান্তর পেরিয়ে চলেছেন তার মহিমান্বিত বর্ণনা কম্বনের কবি শক্তির পরিচয় দেয়। তাঁর বর্ণনা প্রকৃত অর্থেই মহাকাব্যিক বর্ণনা। কম্বনের রামায়ণের ভিস্যুয়াল এফেকট মারাত্মক। কল্পনাপ্রবণ পাঠকের চোখে সমস্ত দৃশ্যই রঙিন চলচ্চিত্রের মতো উঠে আসবে। রচনাশৈলী কবিত্বময়। শব্দগুচ্ছের অফুরন্ত স্মৃতি, উপমেয়তা ও রূপক প্রয়োগে পারদর্শী। অনেক সময় কোন কথা সরাসরি না বলে পরোক্ষভাবে উল্লেখ করেন। কিভাবে করুণরসে পাঠককের প্লাবিত করতে হয় জানেন। বুদ্ধিদীপ্ত হেত্বাভাস ও কবিত্বময় উদ্ভট ধারণায় রামকথাই পরিপূর্ণ। নাট্যরসের প্রয়োগে সিদ্ধহস্ত। সংলাপ ধর্মী নাটকীয় দৃশ্য রচনায় ক্লাসিক্যাল বাল্মিকীর চেয়ে রোমান্টিক কম্বন অনেক পরিণত। কম্বনের রামায়ণ পড়তে পড়তে মনে হবে যেন কোন আধুনিক উপন্যাস পড়ছি। প্রথম দর্শনে ভালোবাসার ধারণা কম্বনের রামায়ণে আছে। বাল্মিকীর রামায়ণে নেই। কম্বন রামায়ণে মিথিলা শহর, রাম সীতার বিয়ের যে বর্ণনা আছে তার সঙ্গে সাম্প্রতিক দক্ষিণ ভারতীয় হিন্দু-বিয়ের অনেক কিছু মিল আছে। স্পষ্টত বোঝাই যাচ্ছে কম্বন রচিত রামকথাই-এর প্রভাব ভারতীয় সমাজ জীবনে অনেকবেশি বাল্মিকী রামায়ণের চেয়ে, যেমন ষোল শতকে উত্তর ভারতে তুলসীদাসের রামচরিত মানসের প্রভাব।

কম্বনের রামায়ণ ছ-কান্ড রামায়ণ। বালকান্ডে ১৮টি সর্গ, অযোধ্যা কান্ডে ১০টি সর্গ,অরণ্য কান্ডে ৮টি সর্গ, কিষ্কিন্ধ্যা কান্ডে১২টি সর্গ, সুন্দর কান্ডে ১৪টি সর্গ ও যুদ্ধ কান্ডে ২০টি সর্গ আছে। বাল্মিকী রামায়ণের সাত কান্ডের উত্তর কান্ড কম্বনের রামকথাই-এ নেই। কম্বনের রামায়ণের কান্ড ও সর্গ ভাগ এই রকম:

বালকান্ড: ১. প্রস্তাবনা, ২.নদী, ৩. মাঠ-ঘাট, ৪. শহর, ৫. রাজা, ৬.দেবতার মর্ত্যে নেমে আসা, ৭.হস্তান্তর (বিশ্বামিত্রের হাতে রাম—লক্ষণ), ৮. তাড়কা বধ, ৯. যজ্ঞ, ১০. অহল্যা, ১১. মিথিলার পথে, ১২. ধনু, ১৩. মিথিলা যাত্রা (রামের বিয়েতে রাজা দশরথের), ১৪. স্বাগত, (গঙ্গাতীরে এসে জনক রাজা রাজা দশরথকে স্বাগত জানান) ১৫. বরযাত্রীদের শোভাযাত্রা, ১৬. সীতার প্রণয়, ১৭. বিবাহ ১৮. পরশুরাম

২. অযোধ্যা কান্ড: ১. মন্থরার ষড়যন্ত্র ২. কৈকেয়ীর কৌশল, ৩. বিদায় (রামের) ৪. দশরথের মৃতদেহ সুবাসিত রাখা, ৫. গঙ্গা. ৬. চিত্রকূট, ৭. সৎকার (দশরথের), ৮. রাম

বনবাসের পথে, ৯. গঙ্গা–দৃশ্য ১০. পাদুকা (রামের) মুকুট পরিহিত

৩. অরণ্য কান্ডঃ ১.সূর্পনখা, ২.খর হত্যা, ৩. সূর্পনখার কৌশল, ৪. মারীচের মৃত্যু, ৫. রাবণের পরিকল্পনা, ৬. জটায়ুর মত্যু, ৭. সীতার খোঁজে, ৮. শবরী

৪. কিষকিন্ধ্যা কান্ডঃ ১. হনুমান ২. বন্ধুত্ব স্থাপন (রাম-সুগ্রিব), ৩. মরামরাস, ৪. দুন্দুভি, ৫. গয়না, ৬. বালী বধ, ৭. সুগ্রিব রাজা, ৮. বর্ষাকাল, ৯. কিষকিন্ধ্যা, ১০. দূতপ্রেরণ, ১১. সুড়ঙ্গপথে যাওয়া, ১২. মহেন্দ্র

৫. সুন্দর কান্ডঃ ১. সমুদ্র লাফ, ২. শহর(লঙ্কা) পরিক্রমা, ৩. সীতাকে দেখতে পাওয়া, ৪. হনুমানের আত্মপ্রকাশ, ৫. টিকলি, ৬. তরুবীথি তছনছ, ৭. কিঙ্কারাস হত্যা, ৮. জম্বুমালি হত্যা, ৯. সেনাবাহিনীর পাঁচ অধিনায়ক হত্যা, ১০. অক্ষ কুমার হত্যা, ১১. ফাঁস, ১২. হনুমান মুক্ত ১৩. লঙ্কায় আগুন, ১৪. রামের কাছে ফেরা

৬. যুদ্ধ কান্ডঃ ১. রাজ দরবারে রাবণ, ২. বিভীষণ আশ্রিত (রামের), ৩. বিনয়ী বরুণ, ৪. সমুদ্র সেতু নির্মাণ, ৫. লঙ্কায় অবতরণ, ৬. সেনা বাহিনীকে আক্রমণের নির্দেশ, ৭. অঙ্গদ দূত, ৮. যুদ্ধের প্রথম দিন, ৯. কুম্ভকর্ণ বধ, ১০. নাগপাশ, ১১. ব্যাপক ধ্বংস হত্যা, ১২. ওষধি পাহাড় (বিশল্যকরণী), ১৩. নিকুম্ভিলা যজ্ঞ, ১৪. ইন্দ্রজিৎ বধ, ১৫. রাবণের শোক, ১৬. রাবণের শিবির, ১৭. রামের শিবির, ১৮. মুক্তি ও প্রত্যাবর্তন, ১৯. রাজ্যে অভিষেক (মুকুট গ্রহণ) ২০. বিদায়

বালকান্ডঃ

ক) কম্বনের রামকথাই-এর সূত্রপাত প্রস্তাবনা স্তোত্র দিয়ে যেখানে রামের বন্দনার সাথে কবি যে রামায়ণ রচনা করতে যাচ্ছেন তার ভাষা ও ছন্দ কি হবে তাও বলে নিচ্ছেন এবং নিজের সৃষ্টিকে লো প্রোফাইলে রাখতে চাইছেন। রামের কাজকে তিনি সবরকম কলঙ্ক বা নিন্দার উর্ধ্বে রাখতে চাইছেন। বলতে চাইছেন রাম সবার আদর্শ। আর রামরাজ্য ইউটোপিয়ার জগৎ।

খ) কোশল রাজ্যের এক নদীর বর্ণনা। এ নদীটি যেন স্ট্রিম অব কনশাসনেস-এর নদী। আশ্চর্যজনকভাবে বিজ্ঞানসম্মত বৃষ্টির বর্ণনা আছে। যে নদী বন্যার পর তৃণভূমি হয়ে ওঠে চাষ যোগ্য জমি, পাহাড় হয়ে ওঠে উপত্যকা, পরিত্যক্ত ও নানা ভূমি হয়ে ওঠে উর্বর জমি। নদী তার ইচ্ছে মত গতিপথ ও আকৃতি বদলায়। বিরামহীন জন্ম ও মৃত্যুর ভাগ্যচক্র বদলে চলছে।

গ) এর পর বাল্মিকী বর্ণিত ও প্রশংসিত দেশটির বর্ণনা কম্বন দিচ্ছেন, এ-বর্ণনার মধ্যে চোখের সামনে ভেসে ওঠে এক যাদু বাস্তব পৃথিবী, যেখানে সবুজ শস্যক্ষেত, সোনা–দানা মণিমুক্তোর ছড়াছড়ি। সবুজ ধান ক্ষেত, চাষ করলেই যেখানে সোনা ফলে। ঝিনুক থেকে মুক্তো বেরয়, খামারে জমে ওঠে পল-কাটা মণি-মাণিক্য, পর্যাপ্ত মাছ আর উপচে পড়া আখ ক্ষেত আর মৌমাছিরা সারাক্ষণ মধু জমা করে চলেছে। সে দেশে ভরন্ত যুবতীরা তাদের নিটোল সৌন্দর্যে পুরুষদের মুগ্ধ করে রাখে। আর তারা যখন তন্বী কোমর ডুবিয়ে নদীতে স্নান করে চতুর্দিক ফুলের সুগন্ধে আমোদিত হয়। জাফরানে তারা তাদের বক্ষস্থল আবৃত

করে। সবাই সুখী, সবাই সব কিছুতে সন্তুষ্ট। তারা গান গায়, হাসিতে মধুর থাকে, নাচে, অতিথি আপ্যায়নে উৎসব করে। তারা সবাই ভালো, মিথ্যা কি কেউ তা জানে না, ফলে ন্যায় বিচারের প্রয়োজনই হয় না। এই দেশের নারীদের ভালোবাসা থেকে উৎসারিত হয় যৌন বিশুদ্ধতার আভা আর তাদের পবিত্রতা থেকে নেমে আসে ঋতুমতী বৃষ্টি।

ঘ) অযোধ্যা নগরীর বর্ণনা। স্বর্গের চেয়েও সুন্দর। যারা স্বর্গ দেখছে তারাও এ নগরে এসে বাসা বাঁধতে চাইবে। এই নগরীর বর্ণনা কম্বন সৌন্দর্যের দেবীর মুখের সঙ্গে তুলনা করতে চান। যেখানে ব্রহ্মণ-বিষ্ণু মহেশ্বর, ইন্দ্র ও কুবের এসেও বসবাস করতে চাইবেন। এ নগরীর সৌন্দর্য দেখলে স্বর্গের স্থপতি মায়ারও সৃষ্টি থমকে দাঁড়াবে। দেবতা বা মানুষ সবাই এ শহরে এসে শান্ত ও সংযত হয়ে যায়। শহরে সবার নিরাপত্তা সুনিশ্চিত। ভয়ঙ্কর কালীর মতো, এ শহর উপসাগরে বাতিঘরের মতো আলো জ্বেলে রাখে। এ শহরের বর্ণনা ভাষায় দেওয়া যায় না। এমনকি আকাশ আলোকিত করে যে সূর্য, অযোধ্যার রানির জ্যোতির কাছে তা ম্লান ছায়া মাত্র। ঘরে ঘরে লক্ষ্মী, ফলে এ শহরে অন্ধকার নেই। মানুষ অবসর কাটায় উদ্যানে, স্নান করে সাঁতার কাটে সুন্দর নদীবক্ষে, অনেকেই প্রেমের কবিতা লিখে সময় কাটায়, সারাদিন যে দুন্দুভির শব্দ ওঠে বৃষ্টির-মেঘ আর সমুদ্রকে লজ্জা দেয়। যেহেতু চোর নেই, নগরীতে কোন প্রহরী নেই। নেওয়ার কেউ নেই। দেওয়ার কেউ নেই। সবাই পড়াশোনা নিয়ে থাকে, কেউ বিদ্যার বড়াই করে না, কেউ বিদ্যা নিয়ে লজ্জাবোধও করে না। যেহেতু যার যা প্রয়োজন পূর্ণভাবে আছে, কেউ ধনী না কেউ গরিব না। এ শহর যেন এক কল্পরাজ্য।

চ) স্বর্গ থেকে মর্ত্যে দেবতার অবতরণ;

একদিন রাজা দশরথ বশিষ্ঠর মতো ঋষিকে বললেন, আমি ও আমার পূর্বপুরুষরা দীর্ঘদিন সসাগরা পৃথিবী শাসন করেছি। সূর্যের চেয়েও দীপ্ত আমাদের সাম্রাজ্য। আমারও রাজত্বের ৬০,০০০ বছর হয়ে গেল। কিন্তু একটা যন্ত্রণাই বুকে বাসা বেঁধে আছে। আমার পরে কী হবে?

রাজা দশরথের কথা শুনে বশিষ্ঠ মুনির একটা ঘটনার কথা মনে পড়ে গেল। রাক্ষসদের হাতে নাজেহাল হয়ে দেবতারা শিবের কাছে যান সাহায্য চাইতে। শিব দেবতাদের চারমুখ--ব্রহ্মার কাছে যেতে বললেন। ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা তাদের বিষ্ণুর কাছে নিয়ে গেলেন। করজোড় দেবতারা বিষ্ণুর কাছে দশমুন্ডু রাবণ, তাঁর ভাই ও রাক্ষসের হাতে তাঁদের লাঞ্ছনার কথা বললেন। বিষ্ণু দেবতাদের বললেন, দুঃখ করে লাভ নেই, আমি যথা সময় রাবণকে বধ করে পৃথিবীকে রাক্ষস মুক্ত করব। ইতিমধ্যে এখানে উপস্থিত দেবতারা বানর হয়ে মর্ত্যে অবতরণ করে পাহাড়, জঙ্গল, ঝোপে ঝাড়ে আশ্রয় নিক।

বিষ্ণু বললেন, আমি নিজে রাজা দশরথের পুত্র হয়ে জন্ম নেব এবং আদিশেষ নাগ, আমার শাঁখ ও সুদর্শন চক্র আমার ভাই হিসেবে জন্ম নেবে। এ-কথা স্মরণে আসতেই বশিষ্ঠ বললেন, দুঃখ করে লাভ নেই, মহাত্মন, পুত্র কামনায় যজ্ঞ করুন, আপনার পুত্র হবে এবং তারা আমাদের সপ্তবিশ্ব ও স্বর্গের সপ্তবিশ্বকে পাহারা দেবে—যাতে রাক্ষসের কারো কোন ক্ষতি না করতে পারে। দশরথ খুশি হয়ে জিগ্যেস করলেন, কে যজ্ঞের পুরোহিত হবেন?

বশিষ্ঠ বললেন, ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি। রাজা দশরথ সারথি সুমন্ত্রকে রথ নিয়ে পাঠিয়ে দিলেন ঋষ্যশৃঙ্গকে আনতে। যজ্ঞ হল। দশরথের পুত্র লাভ হল। কৌশল্যার গর্ভে রাম, কৈকেয়ীর গর্ভে ভরত, সুমিত্রার গর্ভে লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন।

ছ) দশরথের রাজ সভায় বিশ্বামিত্র মুনি এলেন। যাঁকে সবাই ভয় পেত। রেগে গেলে অগ্নিশর্মা। একবার তিনি শপথ নিয়েছিলেন নতুন পৃথিবী ও নতুন ব্রহ্মা সৃষ্টি করার। মুনি রাজাকে বললেন, রাক্ষসেরা তাঁর যজ্ঞে বিঘ্ন ঘটাচ্ছে। অতএব সুকুমার কৃষ্ণবর্ণ রামকে আমার সঙ্গে দিন, রাম যজ্ঞক্ষেত্র পাহারা দেবে। মুনির একথা শুনে রাজা দশরথের মনে হল স্বয়ং মৃত্যু তাঁর সামনে উপস্থিত। রাজা নিজে যজ্ঞ পাহারা দিতে চাইলেন। রাগে বিশ্বামিত্রের চোখ রক্তবর্ণ, পৃথিবীকে ঢেকে নিল অন্ধকার! বিপদ বুঝে বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রমুনিকে শান্ত করে, দশরথকে বললেন, বিশ্বামিত্র-র সঙ্গে রামকে দিন। দশরথ লক্ষ্মণকে রামের সঙ্গে দিলেন। বললেন, আপনিই ওদের অভিভাবক, দেখবেন। মুনির রাগ কমে এল। তির ধনুক সজ্জিত রাম-লক্ষ্মণ স্বর্গ-নগরী ছেড়ে ছায়ার মতো মুনির অনুসরণ করলেন। রাজা দশরথ শয্যা নিলেন। তাঁর জীবন সুতোয় ঝুলে রইল । মনির সঙ্গে যেতে যেতে একদিন এক রাত্রি চলে গেল। পথে পড়ল জ্বলন্ত মরুভূমি। অসহ্য গরম। মুনি বুঝলেন সুকুমার রাম-লক্ষণ এই গরম সহ্য করতে পারবে না। তিনি তাদের দুটো মন্ত্র শিখিয়ে দিলেন। মন্ত্র উচ্চারণ করা মাত্র মরুভূমির আগুন নিভে গেল। উষ্ণতা কেটে কেলাসিত জলের মতো ঠান্ডা দেখা দিল।

রাম নতমস্তকে মুনিকে জিগ্যেস করলেন, মান্যবর, দয়া করে বলুন, শিব নেত্রের আগুনেই কি সব কিছু পুড়ে ছাই হয়ে ঊষর ভূমি দেখা দিয়েছিল?

বিশ্বামিত্র রামকে বললেন, কিছুক্ষণের মধ্যেই জানতে পারবে এক ভয়ঙ্কর রাক্ষসীর জন্যে বিস্তৃত অঞ্চল মনুষ্যহীন মরুভূমি হয়ে গেছে। সে ইচ্ছে করলেই পৃথিবীকে উপড়ে ফেলতে পারে, সমুদ্রকে এক নিশ্বাসে শুষে নিতে পারে, আকাশকে ছিন্নভিন্ন করে দিতে পারে! অসংখ্য অশুভ শক্তির মিলনে এই নারীর ক্ষমতা। দানবীর মতো সর্বত্রই ঘুরে সে বেড়ায়। দুটো পাহাড় গড়াতে গড়াতে যে শক্তি জন্ম নেয়, যে বিষ উগরে দেয়, বজ্রের মতো তার স্বর বিদ্যুতের মতো ঝলসে ওঠে। দুটো পাহাড়চূড়ো সমুদ্র ফুঁড়ে উঠলে যেমন লাগে, এমনই তার ভয়ঙ্কর মূর্তি! অরণ্যবাসী, সাপের মতো ফণা তোলা এই রাক্ষসীর নাম তাড়কা। এই রাক্ষসীই শস্য শ্যামল প্রান্তরকে মরুভূমি করে দিয়েছে। সৃষ্টির সমস্ত প্রাণীকেই সে তার খাবার মনে করে। কয়েক দিনের মধ্যেই সে সবকিছু গ্রাস করে নেয়। লঙ্কার রাজা রাবণের নির্দেশে সে এখন আমার যজ্ঞ পন্ড করতে তৎপর।

রাম মুনিকে জিগ্যেস করলেন, কোথায় এই দানবী বাস করে? রামের কথা ফুরোনোর আগেই আগ্নেয়গিরির ধোঁয়ার মতো তাড়কা রাক্ষসী দেখা দিল। তাড়কা যেহেতু নারী, ক্ষত্রিয় রাম তাকে বধ করা উচিত হবে কীনা? ভাবছিলেন। অন্তর্যামী মুনি সে কথা জানতে পেরে রামকে বললেন,তাড়কা কোন নারী না, দানবী। ধ্বংসের প্রতিমূর্তি, অতএব তাকে বধ করা রামের কর্তব্য।

রাম মুনির কথা শিরোধার্য করে নিয়ে ভয়ঙ্কর তাড়কার সঙ্গে যুদ্ধ রত হলেন এবং তাড়কাকে বধ করলেন। তিরবিদ্ধ তাড়কার রক্তে অরণ্য সমুদ্রের মতো লাল হয়ে গেল।

মনে হল অরণ্যে নেমে এসছে প্রাক্‌সন্ধ্যার রক্তবর্ণ আকাশ।

আনন্দে দেবতারা মুনিকে বললেন, যাক এবার আর নিরাপত্তার ভয় রইল না, আপনার যজ্ঞে আর কেউ বিঘ্ন ঘটাতে পারবে না। আকাশ থেকে পুষ্প বৃষ্টি হল।

জ) দেবতাদের অনুরোধ মত বিশ্বামিত্র রামকে বহু স্বয়ংক্রিয় ক্ষেপাণাস্ত্রের মন্ত্র শিখিয়ে দিলেন। সেই সব মন্ত্র উচ্চারণে রাম অসীম ক্ষমতার অধিকারী হলেন।

কিছুদূর এগিয়ে রাজ পুত্রেরা একটা বনে প্রবেশ করলেন, মুনির কাছে জানতে চাইলেন বনভূমির ইতিহাস। মুনি তাদের মহাবলীর কাহিনী শোনালেন। কিভাবে বিষ্ণু বামনব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে বলীর কাছে পৃথিবীতে তিন-পা রাখার মতো জমি চাইলেন, আর তা দেওয়ার অঙ্গি কার করা মাত্র বিষ্ণু একপা মর্ত্যে অন্য পা স্বর্গে রেখে তৃতীয় পা রাখার জায়গা চাইলেন এবং বলী নিজের মাথাটা এগিয়ে দিতে বাধ্য হলেন। দেবতারা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। বিষ্ণু ক্ষীরসমুদ্রে নিজের শয়ন শয্যায় লক্ষ্মীর কাছে ফিরে গেলেন। বিশ্বামিত্র মুনি নিরুপদ্রবে যজ্ঞ করলেন। তাড়কার ভাইরা যজ্ঞ ভন্ড করতে এলে, রাম ক্ষেপণাস্ত্র ছুঁড়ে, তাদের বধ করলেন।

ঝ) এরপর মুনি রাম-লক্ষ্মণকে মিথিলায় জনকরাজার যজ্ঞ দেখতে নিয়ে চললেন। তিনজনে শোন নদীর তীরে পৌঁছেলেন। ধীর প্রবাহিত গঙ্গা নদী দেখলেন। প্রতিটি দৃশ্যেই কম্বন অসাধারণ প্রকৃতির বর্ণনা দিয়েছেন এবং সে বর্ণনা খুবই কাব্যিক। শেষে তাঁরা জনক রাজার দেশ বিদহে পৌঁছালেন। রাজা ঋষিতে রূপান্তরিত। তাঁকে রাজর্ষি জনক বলা হত। মিথিলার কাছে এসে রাম একটা বড় পাথর দেখতে পেলেন। ঋষি গৌতম-এর স্ত্রী অহল্যা ঋষির অভিশাপে পাষাণ হয়ে আছে। রাম সে পাথরে পদস্পর্শ করা মাত্র অহল্যা শাপ থেকে মুক্তি পেলেন। রাম ও লক্ষণ দুজনেই বিস্মিত হয়ে মুনির কাছে জানতে চাইলেন কি ব্যাপার? মুনি তাঁদের ঋষি গৌতম-র কাহিনী শোনালেন—কিভাবে ঋষির ছদ্মবেশে দেবরাজ ইন্দ্র অহল্যার সঙ্গে উপগত হন। আর ঋষি সমস্ত ঘটনা জানতে পেরে অভিশাপে অহল্যাকে পাষাণ করে দেন এবং ইন্দ্রের শরীরে সহস্র যোনিচোখ করে দেন। দেবরাজ ইন্দ্র বিড়ালের ছদ্মবেশে পালাতে চেষ্টা করেছিলেন। অহল্যার কাতর অনুরোধ ঋষি তাকে বলেন, একমাত্র রামের পদস্পর্শে সে পুনরায় নিজেকে ফিরে পাবে। বিশ্বামিত্র বললেন, আজ সেই ঘটনা ঘটল। পর্ণ কুটির থেকে ঋষি গৌতম বেরিয়ে এলেন। রাম-লক্ষ্মণ বিশ্বামিত্রকে দেখে অবাক। তাঁদের স্বাগত জানালেন। বিশ্বামিত্র ঋষিকে তাঁদের আগমনের উদ্দেশ্য জানালেন।

ঞ) এবার কম্বন মিথিলা দুর্গ নগরীর অপূর্ববর্ণনা দিয়েছেন। নিসর্গ দৃশ্যের বর্ণনা যে কোন পাঠককে মুগ্ধ করবে। যে কোন আধুনিক গ্রাম-শহর এই বর্ণনার কাছে হার মানবে। কম্বন-এর রামায়ণের ভিস্যুয়াল এফেক্ট মারাত্মক। মিথিলা যেন এক ইউটোপিয়া জগৎ। অযোধ্যা নগরীর বর্ণনাতেও আমার একই রকম দৃশ্য দেখেছি। বিশেষত নগরের কুমারী ও রমণীদের সৌন্দর্য যে কোন মানুষকে আকৃষ্ট করবে।

দুর্গের ভেতর রাজবাড়ি। রাজবাড়ির চারধারে গঙ্গা থেকে খাল কেটে এনে পরিখা ঘেরা। স্বর্গের চেয়েও সুদৃশ্য মিথিলা নগর। এ নগর পথে ঘোরার সময় সীতাকে রাম দেখে ফেলেন। কিছু সময়ের জন্য কেউ কারো থেকে চোখ ফেরাতে পারেন না। রাজর্ষি জনক

তাঁদের স্বাগত জানালেন। রাম ও লক্ষ্মণের জন্য রাজবাড়ির বিশেষ অতিথি আবাসে থাকার ব্যবস্থা। সারারাত রামের চোখে ঘুম এল না, মুহূর্তের দেখা সীতার কথা ভেবে। রাম তখনো জানেন না মেয়েটি সীতা। তবে, কম্বনের রামায়ণে আদিরসের প্রভাব বেশ ভালোভাবেই আছে। বিশেষভাবে নারী দেহের বর্ণনায়।

রাজর্ষি জনকের যজ্ঞ তাঁরা দেখলেন। হাজার দুন্দুভির আওয়াজে যজ্ঞের বলিদান শেষ হল, রাজর্ষি তাঁদের পাশের একটা বড় হল ঘরে নিয়ে এলেন। রাম, লক্ষ্মণ ও বিশ্বামিত্রকে মূল্যবান পাথর খচিত সিংহাসনে বসালেন। সভায় রাজকুমারদের শৌর্যবীর্যের পরিচয় দিলেন। বললেন, এঁরা মহান রাজা দশরথের পুত্র। যজ্ঞ দেখতে এসেছেন। হরধনু-ও দেখবেন।

ট) রাজর্ষি জনকের নির্দেশে ষোল হাজার বলিষ্ঠ মানুষ কাঁধ লাগিয়ে সোনার ধনুটি বয়ে আনল। বিশাল সেই ধনু প্রায় গোটা বড়ঘরটা ঢেকে নিল। কেউ কি তাতে জ্যা রোপণ করতে পারে? ধনু তো নয় যেন একটুকরো সোনার পাহাড়। ব্রহ্মা এই ধনু নিজে তৈরি করেন নি, প্রার্থনার জোরে পেয়েছিলেন। ধনু নিয়ে সমবেত জনগণের মধ্যে নানা বিস্ময় ও গুঞ্জন উঠল। একে একে রাজারা এসে সেই ধনু তুলতে ব্যর্থ হলেন। এবার এলেন রাম। সবাই হায় হায় করে উঠল, উদ্বেগ, আশঙ্কায়। একটা বাচ্চা ছেলে রাম, তার পক্ষে কী হরধনু তোলা সম্ভব? জ্যা রোপণ তো দূরের কথা। রাম অনায়াসে হরধনু তুললেন। জ্যা রোপণ করলেন। চোখের পলক পড়ে না সবার। জ্যার টানে রাম হরধনু ভাঙলেন! বজ্রনাদে হরধনু ভেঙে পড়ল। স্বর্গ থেকে পুষ্পবৃষ্টি ঝরে পড়ল। শুধু তাই না, মেঘ থেকে স্বর্ণ বৃষ্টি হল। মুনি ঋষিরা রামকে আর্শীবার্দ করলেন।

বাল্মিকী রামায়ণে রাম মানুষ-শ্রেষ্ঠ মানুষ। কিন্তু কম্বনের রামায়ণে ভক্তি আন্দোলনের প্রভাব। রামের মধ্যে কম্বন দেবত্ব আরোপ করেছেন। শুধু তাই না, নানা অলৌকিক বা মহাজাগতিক ঘটনার প্রভাব সেখানে। রামের যে কোন ভালো কাজে স্বর্গ থেকে দেবতারা পুষ্প বৃষ্টি করেন। যে কোন মহাকাব্যের মতো কম্বনের রামায়ণেরও অনেক বাড়াবাড়ি বর্ণনা আছে। রাজর্ষি জনক স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। তাঁর যজ্ঞের ফল ফলেছে।

অন্তঃপুরে খবর পৌঁছোল। খুশিতে ডগমগ সুন্দরী প্রিয় সখী এসে পাগলের মতো নৃত্য জুড়ে দিল। হতভম্ব ও বিস্মিত সীতা জানতে চাইলেন, কি ব্যাপার? সখী তখন রামের হরধনু ভাঙার খবর দিল! সীতা তার কাছে জানতে চাইল, গতকাল মুনির সঙ্গে এক মেঘবর্ণ কুমারকে দেখেছেন—তিনিই কি হরধনু ভেঙেছেন?

দূত মারফৎ মিথিলার ঘটনার কথা অযোধ্যার রাজা দজশরথের কাছে পাঠান হল।

ঠ) দূতের কাছে রাজর্ষি জনকের বার্তা পেয়ে দশরথও বিস্মিত! রাম হরধনু ভেঙেছে! হরধনু ভাঙার শব্দ তাঁর কানেও পৌঁছেছে। রাজা ভরত, শত্রুঘ্ন, সোনা-দানা-মণি-মাণিক্য লোকলস্কর কনভয় নিয়ে মিথিলা পৌঁছে গেলেন।

এই যাত্রাপথের সুদৃশ্য বর্ণনা কম্বনের রামায়ণে অসাধারণ। তিনি যে বড় কবি তার পরিচয় দেয়। শুধু তাই না, কম্বনের সময়েও সাহিত্যের একটা বড় অংশ জুড়ে প্রকৃতি ও পরিবেশের প্রভাব ছিল বোঝা যায়। আধুনিক বা উত্তর আধুনিক সাহিত্য থেকে এই প্রকৃতির

বর্ণনা হারিয়ে যাচ্ছে। প্রাকৃতিক পরিবেশের দেখাও মিলছে না। কম্বনের রামায়ন যৌনতা সম্পৃক্ত হলেও যৌনতা নিয়ে কোথাও বাড়াবাড়ি নেই।

ড) মিথিলা শহর ময়ূর আর হরিণে ভর্তি। চর্তুদিকে ফুলের পরিবার, লোকজন, বিভিন্ন রাজ্য থেকে আসা রাজ্যন্যবর্গ, পরির মত সুন্দরী মেয়েরা, উৎসবে মুখরিত মিথিলা। রামের সঙ্গে সীতার বিয়ে হয়েও গেল রাজপুরোহিত বশিষ্ঠ ও মুনি কৌশিকের তত্ত্বাবধানে।

বরযাত্রীদের শোভা যাত্রা, সীতার প্রণয় ও বিয়ে--কম্বনের রামায়ণে এই তিন সর্গের বর্ণনা যে কোন পাঠককে মুগ্ধ করবে। বিশেষত বিয়ে-সর্গে সীতার আত্মকথন, নিজের সঙ্গে সংলাপ মহাকাব্য রচনায় কম্বনের কৃতিত্বের পরিচয় দেয়।

ঢ) বিবাহিত দম্পতির আর্শীবাদ করে মুনি কৌশিক উত্তরে হিমালয়ে পর্বতে চলে গেলন, কিছুদিন রাম সীতার সুখেই কাটল। এবার রাজা দশরথ সৈন্য-সামন্ত নিয়ে অযোধ্যা ফিরতে চাইলেন। মিথিলাবাসীরা শোকে ভেঙে পড়ল।

পথে তাঁরা পরশুরামের মুখোমুখি হলেন। কুঠার হাতে পরশুরাম। ভয়ঙ্কর তাঁর মুর্তি। চোখ থেকে যেন আগুনের গোলা বেরচ্ছে। বজ্রের মতো গলার স্বর। পরশুরামকে দেখে দশরথের সৈন্যরা ভয়ে উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে লাগল। যিনি একাই ভয়ঙ্কর কুঠারে একুশটি ক্ষত্রিয় বংশকে শেকড় ও শাখা সমেত রক্ত গঙ্গায় ডুবিয়ে শেষ করে দিয়েছেন!

রামের রথের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে হাঁক দিলেন, কে যায়? বিপদ বুঝে রাজা দশরথ পরশুরামের পায়ে পড়ে গেলেন। কিন্তু পরশুরাম রামের উদ্দেশে বললেন, আমি শুনেছি তুমি হরধনু ভেঙেছে? এবার আমার হাতে তোমার কাঁধ থেকে মাথা খসে পড়বে!

রাজা দশরথ অনুনয় বিনয় শুরু করলেন। বললেন ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরও আপনাকে ভয় পায়, সমগ্র পৃথিবী আপনি জয় করেছেন। কেন এই দুর্বলের প্রতি নিষ্ঠুর আঘাত হানতে চান? আমার ছেলে তো আপানার শত্রু না।

পরশুরাম রাজার কথায় কর্ণপাত করলেন না। ভয়ে রাজা পাথর হয়ে গেলেন। পরশুরাম রামকে বললেন, আমার শত্রুতা তোমার সঙ্গে নয়, তোমাদের ক্ষত্রিয় বংশের সঙ্গে। কারণ আমার নির্দোষ বাবকে তোমাদের একজন হত্যা করেছিলেন! পরশুরাম সেই কাহিনী বললেন। তারপর বললেন পাহাড় থেকে তিনি হরধনু ভাঙার শব্দ পেয়ে দৌড়ে এসেছেন। হরধনু ভেঙেছো, ভালো কথা। এখন আমার এই ধনুটি জ্যা পরিয়ে সাহস থাকে তো আমার সঙ্গে যুদ্ধ কর। যদি হারাতে পারো আমি ক্ষত্রিয় বংশ ধ্বংসের শপথ থেকে সরে দাঁড়াবে। এ ধনু বাঁকাতে পারলে কোন রাজাই তোমার সামনে দাঁড়াতে পারবে না।

রাম স্মিত হেসে পরশুরামের কাছ থেকে ধনুটা নিলেন এবং বাঁকিয়ে দিলেন। পরশুরাম ভয় পেয়ে গেলেন। রাম পরশুরামকে বললেন, আপনি পৃথিবীর ক্ষত্রিয় রাজাদের হত্যা করেছেন। কিন্তু যেহেতু আপনি একজন বৈদিক ঋষি ও তপস্বীনির পুত্র, আপনাকে হত্যা করব না। কিন্তু এই তির লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে না। বলুন কোথায় লক্ষ্য ভেদ করব?

পরশুরাম বুঝতে পারলেন রাম কে? বললেন, আমার স্বেচ্ছাকৃত সমস্ত পাপকে তিরবিদ্ধ করুন। রাম তাই করলেন। রামকে প্রণতি জানিয়ে পরশুরাম নিজের পথে চলে গেলেন।

রাজা দশরথ প্রাণ ফিরে পেলেন। একসমুদ্র আনন্দে মেতে উঠলেন। আনন্দে চোখে

জল। স্বর্গ থেকে পুষ্পবৃষ্টি হল।

রাজা দশরথ সবাইকে নিয়ে অযোধ্যা ফিরে এলেন।

এখানেই কম্বন কথিত রামকথাই এর বালকান্ড শেষ। এরপর অযোধ্যা কান্ড, অরণ্য কান্ড, কিষ্কিন্ধ্যাকান্ড, সুন্দর কান্ড ও যুদ্ধ কান্ডর বিস্তৃত বর্ণনায় যাচ্ছি না। বাল্মিকীর রামায়ণই যেহেতু তাঁর রামায়ণের উৎস। বাকি কাহিনী পর পর কি ঘটবে প্রায় সবার জানা। যা লক্ষ্য করার তা হল, কম্বন নিজের কালের প্রেক্ষিতে বাল্মিকী রামায়ণের বিনির্মাণ করেছেন। প্রকৃতি ও পরিবেশ বর্ণনায় কম্বন কল্পনা প্রবণ। যাদুবাস্তবের জগৎ তৈরি করেন। বিভিন্ন চরিত্রের বর্ণনায় দক্ষ এবং নারী দেহের যৌনতা ও যৌন অনুষঙ্গ বর্ণনায় বেশ খোলামেলা। মর্ডান সোসাইটির বিধি নিষেধ যেহেতু তাঁর সময়ে ছিল না, মিশেল ফুকো কথিত পুঁজিবাদী সমাজের যৌনতার ইতিহাস কম্বনের রামায়ণে আমরা খুঁজতে যাবো না। যৌনতার ওপর নজরদারি কম্বনের সময় ছিল না। আধুনিক সভ্যতা যৌনতাকে পণ্য করায়, যত রকম বিকলাঙ্গ মনোবৃত্তি মানুষের মনে বাসা বেঁধেছে।

কম্বনের রামায়ণে বিভিন্ন চরিত্রে দেবত্ব আরোপ করা হয়েছে। রাম অবতার, নারায়ণের মর্ত্যে অবতরণ, সীতা লক্ষ্মী। দেবত্ব আরোপ করা হলেও কম্বনের রামায়ণ সাহিত্য গুণে ও নন্দনতত্ত্বের দিক থেকে বাল্মিকীর রামায়ণের থেকে অনেক বেশি সুখ পাঠ্য। তামিল জীবনে কম্ব রামায়ণের প্রভাব গভীর। দক্ষিণ ভারতের শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতিতে, নন্দনতত্ত্ব ও ধর্ম চিন্তায় কম্বনের রামায়ণের বিরাট প্রভাব। একেক সময় মনে হবে দক্ষিণ ভারতীয়দের জীবন চর্চা ও দৃষ্টিভঙ্গিও যেন কম্বনের রামায়ণ থেকে উঠে এসেছে। কম্বনের রামায়ণেও অনেক বিনির্মাণ ঘটেছে এবং অনেকেই মনে করেন ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে দক্ষিণ ভারতে নিম্নবর্গের মানুষের যে আন্দোলন তাতেও কম্বনের রামায়ণের চরিত্রগুলিকে আন্দোলনকারিরা বিনির্মাণ করে নিয়েছেন--যেখানে রাবণের বীরত্ব মহিমা পেয়েছে। 'রাক্ষস' শব্দের বিনির্মাণ ঘটেছে 'অনার্য' শব্দে। দ্রাবিড়রা তাঁদের পূর্বপুরুষদের অনার্য মনে করেন, অনার্যদের ওপর আগ্রাসন চালিয়ে আর্যরা ভারতে আর্য সভ্যতার বিস্তার ঘটিয়েছিল, যে আর্যদের থেকে ব্রাহ্মণদের উৎপত্তি, তামিল ব্রাহ্মণরা আর্য। দক্ষিণ ভারতীয়দের বর্ণ যেহেতু কালো তাই বর্ণবিদ্বেষ থেকেই আর্যরা তাদের রাক্ষস বলতেন। এই ধরনের বর্ণবিদ্বেষ কিছুদিন আগে পর্যন্ত আফ্রিকার মানুষদের সহ্য করতে হয়েছে। দক্ষিণ ভারতীয়রা রামায়ণের কাহিনীর মধ্যে আর্য সভ্যতা কর্তৃক অনার্য সভ্যতার ওপর বিজয় দেখতে পান। স্বাভাবিক ভাবেই রাবণ, ইন্দ্রজিৎ, কুম্ভকর্ণরা দক্ষিণ ভারতীয়দের কাছে বীরের মর্যাদা পান। এসব সত্ত্বেও উত্তর ভারতে যেমন তুলসীদাসী রামায়ণের প্রভাব, দক্ষিণ ভারতে কম্বনের রামায়ণের প্রভাব এবং সামগ্রিক ভাবে উভয় ভারতে বাল্মিকী রামায়ণের প্রভাব। রামায়ণ ভারতীয় সাহিত্যকে যেভাবে সমৃদ্ধ করেছে বিশ্ব সাহিত্যে তা বিরল ঘটনা। আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যেও রামায়ণের চরিত্র ও বিভিন্ন কাহিনী নিয়ে কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক ও প্রবন্ধ লেখা অব্যাহত। অর্থাৎ আমাদের আধুনিক জীবনও রামায়ণ প্রভাবিত।

রামায়ণের সমাজতাত্ত্বিক ডিসকোর্স

রামায়ণ শুধু ভারতীয় সমাজজীবনকে না, ভারতীয় উপমহাদেশের সমাজজীবন এত ওৎপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে যে, রামায়ণ নিয়ে আধুনিক সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করা যায়। আধুনিক সমাজ জীবন উত্তরআধুনিক সমাজজীবনে প্রবেশ করেছি আমরা, কিন্তু আমাদের এই উপমহাদেশের ভাবনা চিন্তার যতরকম বিন্যাস ও প্যাটার্ন সর্বস্তরে আছে শিল্প—সাহিত্য--চিত্রকলা-সংগীত-নৃত্য—কোন না কোন ভাবে রামায়ণের প্রভাব আছে। এই উপমহাদেশের সংস্কৃতিতে শুধুমাত্র নারীদের অবস্থান নিয়ে রামায়ণের প্রেক্ষিতে নৃতাত্ত্বিক গবেষণার কাজ করা যায়। যুক্তির গঠন অনুযায়ী রামায়ণে বর্ণিত রাজ পরিবারগুলি গঠন বা স্ট্রাকচার, আত্মীয়তার সম্পর্ক আজও কীভাবে ভারতীয় ও ভারতীয় উপমহাদেশের পরিবার ও সমাজ স্ট্রাকচার নির্মাণে প্রবাহমান—তা দেখা যেতে পারে। এই উপমহাদেশের প্রায় সব ধর্ম,সংস্কৃতিতে সমাজজীবনে বংশ পরম্পরা যে সব আত্মীয়তা ও বিয়ের সম্পর্ক—মাঝে মাঝে মনে হয়-তা যেন রামায়ণ থেকে উঠে আসা। রামায়ণ যে সময় লেখা হয়েছিল সেই সময়ের সমাজ ও ইতিহাস অনেক বদলে গেছে, যদিও রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন রামায়ণ ও মহাভারত ইতিহাস, কালগর্ভে তার সমস্ত চিহ্ন হারিয়ে গিয়ে মহাকাব্যের উপাদানের মধ্যে বেঁচে আছে— যার ফলে রামায়ণকে বর্তমানে ইতিহাস বলা যাচ্ছে না, কারণ ইতিহাস চায় তথ্য ও তার প্রমাণ। হোমরের ইলিয়দ ও ওদিসির ইতিহাস সত্যতা নিয়ে প্রায় একই ধারণা আছে। পশ্চিমি নৃতাত্ত্বিক, পুরাতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিকদের মধ্যে ডুর্কহেইম কথিত Elementary forms of the Religious Life, Elementary Structure রামায়ণে যে ভাবে ছিল বা আছে, বর্তমানেও আছে, সেখানে বিষয়ের চেয়ে ব্যক্তিগত সম্পর্ক প্রধান হয়ে ওঠে। রামায়ণের সময়ে অভিজাততন্ত্রের সঙ্গে সম্পর্ক না থাকার ফলেই অহল্যা, শম্বুক ও গুহকের অবস্থান ও পরিণতি ঐ সময়ের স্ট্রাকচারের নিম্নস্তরের একটা ছবি আমাদের সামনে তুলে ধরে। মানুষের স্বাধীনতার প্রকৃতি রামরাজ্য (ইউটোপিয়ান জগৎ) কি রকম ছিল তাও উপলব্ধি করি। অস্তিত্ববাদী জঁ পল সার্ত্রে মনে করতেন, ব্যক্তির ওপর আদর্শ আরোপ করে ক্ষমতাবানরা, রামের ওপর আদর্শ আরোপ করেছিলেন তাঁর সময়ের ক্ষমতাবানরা— যেমন দেবতার, অর্ধদেবতারা ও পন্ডিতবর্গ। এ দৃশ্য আমরা বর্তমান আধুনিক সমাজেও দেখি। অন্যদিকে মানুষের স্বাধীনতা প্রকৃতি নিয়ে লেভি স্ত্রোস তাঁর স্ট্রাকচারালিজমের ধারণা থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত কথা বলেছেন। সার্ত্রের বিষয়ে যদি হয়ে ওঠে রামায়ণের গল্প এবং রামায়ণের চরিত্রগুলি শ্রেণী অবস্থান, লেভি স্ত্রোসের লক্ষ্য রামায়ণের গঠন, আর সেই গঠন নানা ভাষা নানা মত নানা সংস্কৃতিতে বিবর্তিত হয়ে কিভাবে নতুন নতুন রামায়ণ বিনির্মিত হয়েছে তার কথা। রামায়ণের গল্প বাল্মিকী তৈরি করার আগে তা নানা কাহিনীতে আদিবাসী বিভিন্ন জনজাতির মধ্যে ছড়িয়ে ছিল। তা সংগ্রহ করে বাল্মিকী যখন রামায়ণ রচনা করলেন তার স্ট্রাকচার তৈরি হল রামায়ণের সময়ের অভিজাত ক্ষত্রিয়দের সমাজ গঠন অনুযায়ী। ফলে সেই সমাজের ব্রাত্যরা যে অনার্যরা হবে বা নিম্নবর্গের মানুষেরা হবে তা ছিল অবধারিত। বেদ বিশেষজ্ঞ বা বেদ অনুগামী যে রাম-লক্ষ্মণ-ভরত--শত্রুঘ্ন যে

আর্যদের স্থান নেবে (ভারতে আর্যদের আগম নিয়ে যে বিতর্কই থাক, তা অন্যত্র আলোচনার বিষয়) তা জানা কথা। মানুষের আদিম সমাজ ব্যবস্থা থেকেই কি বর্ণবিদ্বেষ দেখা দিয়েছিল? রাম-রাবণের যুদ্ধে রামের পক্ষে বানররা ছিল, যারা অর্ধনর অর্ধপশু। গ্রিক মহাকাব্য দুটিতেও আমরা এরকম অর্ধ-মানব অর্ধ-পশুর দেখা পেয়েছি। অনাদিকের রাক্ষসরা-যাদের বর্ণ কালো, যাদের নরখাদক, যাদুকর, বর্বর—সেই সময়ের সমাজের প্রেক্ষিতে সমাজের শত্রু ভাবা হচ্ছে। 'রাক্ষস' 'নরখাদক' 'মায়াবী', 'যাদুকর','বর্বর', 'দুষ্কৃতি',—এই সব শব্দ বর্তমান আধুনিক সমাজেও ব্যবহৃত হয় এবং কাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হয় এবং কেন ব্যবহার হয় তাও আমরা জানি। আর এইসব অভিধা যারা পায় রাষ্ট্রের চোখে তাদের বর্ণ কালো স্বাভাবিক। রামায়ণের সময় যে দ্রাবিড় সভ্যতা ছিল সেই সভ্যতার মানুষদের বর্ণ ছিল কালো, আর্য সভ্যতার আগ্রাসন তারা ঠেকাতে চেয়েছিল (এরকম যদি কল্পনা করি)—ফলে 'রাক্ষস' (রাবণ), নরখাদক (খর), 'মায়াবী' (তাড়কা), 'যাদুকর' (মারীচ/ইন্দ্রজিৎ), 'বর্বর' (কুম্ভকর্ণ), দুষ্কৃতি (অনারা) এরকম বিশেষণ পাওয়া স্বাভাবিক। আমাদের অনেক আগেই মাইকেল মধুসূদন দত্ত এ-ব্যাপারটা নিজের মতো করে বুঝতে পেরেছিলেন গ্রিক মহাকাব্য পাঠ করে। বাল্মিকী এক হাজার বছর পর তামিল রামায়ণ রচয়িতা কম্বন বুঝেছিলেন। বাল্মিকী রামায়ণকে তিনি নিজের সমাজের স্ট্রাকচারে ফেলে বিনির্মাণ করে নিয়েছিলেন। মাইকেল মধুসূদন দত্তও মেঘনাদ বধ কাব্য—এ রামায়ণকে অনার্যদের পক্ষেই একরকম বিনির্মাণ করে নেন—যেখানে বীরবাহু, মেঘনাদ ও রাবণের প্রতি আমাদের মানবিক বোধ আকৃষ্ট হয়। রাম যেন জঁ ফ্রঁশিশ লিওতার কথিত ক্ষমতা প্রদর্শনের প্রতীক। বাল্মিকী রামায়ণে রামের হাতে ছিল উন্নত প্রযুক্তি, বেদ সম্পর্কে জ্ঞান (আমাদের সময়ের বিজ্ঞান) আর এই বিশেষ জ্ঞান হল ভাষার খেলা। যে ভাষার খেলায় উচ্চবর্গের হাতে কিস্তিমাৎ চাল সব সময় থাকে। চন্ডাল গুহকের সঙ্গে ব্যবহারে রাম এই ভাষার খেলা খেলেছেন, শম্বুকের শিরোচ্ছেদের সময়েও। রামায়ণের এই আদিম স্ট্রাকচার আমরা সমসাময়িক কালের উন্নত ব্যবস্থাতেও দেখি। রামরাজ্যে ন্যায় প্রতিষ্ঠায় রাম যেমন এই ভাষার খেলা খেলেছেন,বর্তমান ফ্রি-মার্কেট, লিবারেল অর্থনীতি ও বিশ্বায়নের যুগে উন্নত রাষ্ট্রগুলির রাষ্ট্রনায়করা খেলেন, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র কৌশকেয়দের কাছ থেকে পাওয়া উন্নত প্রযুক্তি ও ক্ষেপণাস্ত্রে রাম যেমন বলীয়ান ছিলেন, বর্তমানের রাষ্ট্রনেতারাও একই রকম ক্ষমতার অধিকারী উন্নত প্রযুক্তি হাতে থাকায়। অন্যায় ভাবে বালী বধে রাম যে ভাষায় খেলা খেলেছেন, রাষ্ট্র বিরোধীদের খতম অভিযানে রাষ্ট্রনায়করা সেই একই ভাষার খেলা খেলেন। সীতার প্রতি অন্যায় নির্দেশে রাম সেই একই ভাষার খেলা খেলেছেন। রাম পিতৃতান্ত্রিক সমাজের প্রতিনিধি, সীতার প্রতি রামের সন্দেহ দেখে আমরা বুঝতে পারি রামের সময় পরিবারের স্ট্রাকচারে নারীর স্থান ছিল অন্তঃপুরে নারীর প্রধান কাজ ছিল সন্তান উৎপাদন এবং পরপুরুষের লোভে না পড়া। কেউ বলপূর্বক নারীকে যদি হরণ করে নিয়ে যায়—সেক্ষেত্রে নারীকেই অগ্নিপরীক্ষায় প্রমাণ করতে হবে তিনি সতী আছেন অর্থাৎ রামের ন্যায়রাজ্যে নারীদের প্রতিনিধিত্ব ছিল না। রানি হলেও তারা সামান্য নারী। বরং রাবণ রাক্ষস রাজা হয়েও সেক্ষেত্রে সীতাকে মর্যাদা দিয়েছিলেন। বলপূর্বক হরণ করেও ধর্ষণ করে

রামায়ণের সমাজতাত্ত্বিক ডিসকোর্স

রামায়ণ শুধু ভারতীয় সমাজজীবনকে না, ভারতীয় উপমহাদেশের সমাজজীবন এত ওৎপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে যে, রামায়ণ নিয়ে আধুনিক সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করা যায়। আধুনিক সমাজ জীবন উত্তরআধুনিক সমাজজীবনে প্রবেশ করেছি আমরা, কিন্তু আমাদের এই উপমহাদেশের ভাবনা চিন্তার যতরকম বিন্যাস ও প্যাটার্ন সর্বস্তরে আছে শিল্প—সাহিত্য--চিত্রকলা-সংগীত-নৃত্য—কোন না কোন ভাবে রামায়ণের প্রভাব আছে। এই উপমহাদেশের সংস্কৃতিতে শুধুমাত্র নারীদের অবস্থান নিয়ে রামায়ণের প্রেক্ষিতে নৃতাত্ত্বিক গবেষণার কাজ করা যায়। যুক্তির গঠন অনুযায়ী রামায়ণে বর্ণিত রাজ পরিবারগুলি গঠন বা স্ট্রাকচার, আত্মীয়তার সম্পর্ক আজও কীভাবে ভারতীয় ও ভারতীয় উপমহাদেশের পরিবার ও সমাজ স্ট্রাকচার নির্মাণে প্রবাহমান—তা দেখা যেতে পারে। এই উপমহাদেশের প্রায় সব ধর্ম,সংস্কৃতিতে সমাজজীবনে বংশ পরম্পরা যে সব আত্মীয়তা ও বিয়ের সম্পর্ক—মাঝে মাঝে মনে হয়-তা যেন রামায়ণ থেকে উঠে আসা। রামায়ণ যে সময় লেখা হয়েছিল সেই সময়ের সমাজ ও ইতিহাস অনেক বদলে গেছে, যদিও রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন রামায়ণ ও মহাভারত ইতিহাস, কালগর্ভে তার সমস্ত চিহ্ন হারিয়ে গিয়ে মহাকাব্যের উপাদানের মধ্যে বেঁচে আছে— যার ফলে রামায়ণকে বর্তমানে ইতিহাস বলা যাচ্ছে না, কারণ ইতিহাস চায় তথ্য ও তার প্রমাণ। হোমরের ইলিয়দ ও ওদিসির ইতিহাস সত্যতা নিয়ে প্রায় একই ধারণা আছে। পশ্চিমি নৃতাত্ত্বিক, পুরাতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিকদের মধ্যে ডুর্কহেইম কথিত Elementary forms of the Religious Life, Elementary Structure রামায়ণে যে ভাবে ছিল বা আছে, বর্তমানেও আছে, সেখানে বিষয়ের চেয়ে ব্যক্তিগত সম্পর্ক প্রধান হয়ে ওঠে। রামায়ণের সময়ে অভিজাততন্ত্রের সঙ্গে সম্পর্ক না থাকার ফলেই অহল্যা, শম্বুক ও গুহকের অবস্থান ও পরিণতি ঐ সময়ের স্ট্রাকচারের নিম্নস্তরের একটা ছবি আমাদের সামনে তুলে ধরে। মানুষের স্বাধীনতার প্রকৃতি রামরাজ্য (ইউটোপিয়ান জগৎ) কি রকম ছিল তাও উপলব্ধি করি। অস্তিত্ববাদী জঁ পল সার্ত্রে মনে করতেন, ব্যক্তির ওপর আদর্শ আরোপ করে ক্ষমতাবানরা, রামের ওপর আদর্শ আরোপ করেছিলেন তাঁর সময়ের ক্ষমতাবানরা— যেমন দেবতার, অর্ধদেবতারা ও পন্ডিতবর্গ। এ দৃশ্য আমরা বর্তমান আধুনিক সমাজেও দেখি। অন্যদিকে মানুষের স্বাধীনতা প্রকৃতি নিয়ে লেভি স্ত্রোস তাঁর স্ট্রাকচারালিজমের ধারণা থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত কথা বলেছেন। সার্ত্রের বিষয়ে যদি হয়ে ওঠে রামায়ণের গল্প এবং রামায়ণের চরিত্রগুলি শ্রেণী অবস্থান, লেভি স্ত্রোসের লক্ষ্য রামায়ণের গঠন, আর সেই গঠন নানা ভাষা নানা মত নানা সংস্কৃতিতে বিবর্তিত হয়ে কিভাবে নতুন নতুন রামায়ণ বিনির্মিত হয়েছে তার কথা। রামায়ণের গল্প বাল্মিকী তৈরি করার আগে তা নানা কাহিনীতে আদিবাসী বিভিন্ন জনজাতির মধ্যে ছড়িয়ে ছিল। তা সংগ্রহ করে বাল্মিকী যখন রামায়ণ রচনা করলেন তার স্ট্রাকচার তৈরি হল রামায়ণের সময়ের অভিজাত ক্ষত্রিয়দের সমাজ গঠন অনুযায়ী। ফলে সেই সমাজের ব্রাত্যরা যে অনার্যরা হবে বা নিম্নবর্গের মানুষেরা হবে তা ছিল অবধারিত। বেদ বিশেষজ্ঞ বা বেদ অনুগামী যে রাম-লক্ষ্মণ-ভরত--শত্রুঘ্ন যে

আর্যদের স্থান নেবে (ভারতে আর্যদের আগমন নিয়ে যে বিতর্কই থাক, তা অন্যত্র আলোচনার বিষয়) তা জানা কথা মানুষের আদিম সমাজ ব্যবস্থা থেকেই কি বর্ণবিদ্বেষ দেখা দিয়েছিল? রাম-রাবণের যুদ্ধে রামের পক্ষে বানররা ছিল, যারা অর্ধনর অর্ধপশু। গ্রিক মহাকাব্য দুটিতেও আমরা এরকম অর্ধ-মানব অর্ধ-পশুর দেখা পেয়েছি। অন্যদিকের রাক্ষসরা--যাদের বর্ণ কালো, যাদের নরখাদক, যাদুকর, বর্বর—সেই সময়ের সমাজের প্রেক্ষিতে সমাজের শত্রু ভাবা হচ্ছে। 'রাক্ষস' 'নরখাদক' 'মায়াবী', 'যাদুকর','বর্বর', 'দুষ্কৃতি',—এই সব শব্দ বর্তমান আধুনিক সমাজেও ব্যবহৃত হয় এবং কাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হয় এবং কেন ব্যবহার হয় তাও আমরা জানি। আর এইসব অভিধা যারা পায় রাষ্ট্রের চোখে তাদের বর্ণ কালো স্বাভাবিক। রামায়ণের সময় যে দ্রাবিড় সভ্যতা ছিল সেই সভ্যতার মানুষদের বর্ণ ছিল কালো, আর্য সভ্যতার আগ্রাসন তারা ঠেকাতে চেয়েছিল (এরকম যদি কল্পনা করি)—ফলে 'রাক্ষস' (রাবণ), নরখাদক' (খর), 'মায়াবী' (তাড়কা), 'যাদুকর' (মারীচ/ইন্দ্রজিৎ), 'বর্বর' (কুম্ভকর্ণ), দুষ্কৃতি (অনার্যরা) এরকম বিশেষণ পাওয়া স্বাভাবিক। আমাদের অনেক আগেই মাইকেল মধুসূদন দত্ত এ-ব্যাপারটা নিজের মতো করে বুঝতে পেরেছিলেন গ্রিক মহাকাব্য পাঠ করে। বাল্মিকীর এক হাজার বছর পর তামিল রামায়ণ রচয়িতা কম্বন বুঝেছিলেন। বাল্মিকী রামায়ণকে তিনি নিজের সমাজের স্ট্রাকচারে ফেলে বিনির্মাণ করে নিয়েছিলেন। মাইকেল মধুসূদন দত্তও মেঘনাদ বধ কাব্য—এ রামায়ণকে অনার্যদের পক্ষেই একরকম বিনির্মাণ করে নেন—যেখানে বীরবাহু, মেঘনাদ ও রাবণের প্রতি আমাদের মানবিক বোধ আকৃষ্ট হয়। রাম যেন জঁ ফ্রঁশিশ লিওতার কথিত ক্ষমতা প্রদর্শনের প্রতীক। বাল্মিকী রামায়ণে রামের হাতে ছিল উন্নত প্রযুক্তি, বেদ সম্পর্কে জ্ঞান (আমাদের সময়ের বিজ্ঞান) আর এই বিশেষ জ্ঞান হল ভাষার খেলা। যে ভাষার খেলায় উচ্চবর্গের হাতে কিস্তিমাৎ চাল সব সময় থাকে। চন্ডাল গুহকের সঙ্গে ব্যবহারে রাম এই ভাষার খেলা খেলেছেন, শম্বুকের শিরোচ্ছেদের সময়েও। রামায়ণের এই আদিম স্ট্রাকচার আমরা সমসায়িক কালের উন্নত ব্যবস্থাতেও দেখি। রামরাজ্যে ন্যায় প্রতিষ্ঠায় রাম যেমন এই ভাষার খেলা খেলেছেন,বর্তমান ফ্রি-মার্কেট, লিবারেল অর্থনীতি ও বিশ্বায়নের যুগে উন্নত রাষ্ট্রগুলির রাষ্ট্রনায়করা খেলেন, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র কৌশকেয়দের কাছ থেকে পাওয়া উন্নত প্রযুক্তি ও ক্ষেপণাস্ত্রে রাম যেমন বলীয়ান ছিলেন, বর্তমানের রাষ্ট্রনেতারাও একই রকম ক্ষমতার অধিকারী উন্নত প্রযুক্তি হাতে থাকায়। অন্যায় ভাবে বালী বধে রাম যে ভাষায় খেলা খেলেছেন, রাষ্ট্র বিরোধীদের খতম অভিযানে রাষ্ট্রনায়করা সেই একই ভাষার খেলা খেলেন। সীতার প্রতি অন্যায় নির্দেশে রাম সেই একই ভাষার খেলা খেলেছেন। রাম পিতৃতান্ত্রিক সমাজের প্রতিনিধি, সীতার প্রতি রামের সন্দেহ দেখে আমরা বুঝতে পারি রামের সময় পরিবারের স্ট্রাকচারে নারীর স্থান ছিল অন্তঃপুরে, নারীর প্রধান কাজ ছিল সন্তান উৎপাদন এবং পরপুরুষের লোভে না পড়া। কেউ বলপূর্বক নারীকে যদি হরণ করে নিয়ে যায়—সেক্ষেত্রে নারীকেই অগ্নিপরীক্ষায় প্রমাণ করতে হবে তিনি সতী আছেন অর্থাৎ রামের ন্যায়রাজ্যে নারীদের প্রতিনিধিত্ব ছিল না। রানি হলেও তারা সামান্য নারী। বরং রাবণ রাক্ষস রাজা হয়েও সেক্ষেত্রে সীতাকে মর্যাদা দিয়েছিলেন। বলপূর্বক হরণ করেও ধর্ষণ করে

নি। রাজবাড়ির অন্তঃপুরে না রেখে অন্যত্র অশোক বনে রেখেছেন। রামায়ণের বিভিন্ন চরিত্রকে বিনির্মাণ করলে আমরা এক অন্য রামায়ণে পৌঁছে যাই। রামায়ণে সেই ফুকো কথিত প্রত্নশালা যা আজও ভারতীয় সমাজকে প্রভাবিত করে।

রামায়ণ থেকে আমাদের সমাজ জীবনে বিভিন্ন সম্পর্ক কি ভাবে গড়ে উঠেছে, ক্ষমতার সম্পর্কগুলি গড়ে উঠেছে, ব্যক্তিগত, অভিজ্ঞতার পরিকাঠামোর নির্মিত হয়েছে, গবেষণার বিষয়। রামায়ণের পাঠকৃতির কোন নিশ্চিত অর্থ আজ পর্যন্ত তৈরি হয়নি। অর্থের কেন্দ্রহীনতাই বিভিন্ন রামকথায় প্রকাশ পেয়েছে। রামায়ণ বহুবাচনিক স্বরের জন্ম দিয়েছে বলেই বাল্মিকী রামায়ণ, কম্বন রামায়ণ(রামকথাই), তুলসীদাসী রামায়ণ (রামচরিত মানস), মাইকেল মধুসূদন দত্তর রামায়ণ (মেঘনাদ বধ কাব্য) ও অন্যান্য প্রায় তিনশ রামকথা বিভিন্ন রূপ পেয়েছে। বিভিন্ন ভারতীয় সমাজ তা নিজ নিজ বৈচিত্র নিজেদের সংস্কৃতি অনুযায়ী বদলে নিয়েছে ও গ্রহণ করেছে—যেখানে রাম, রাবণ, হনুমান মর্যাদা পেয়েছে এবং সমালোচিতও হয়েছে। সীতার ত্যাগের চেয়ে উর্মিলার ত্যাগ কোন অংশ কম না, কিন্তু উর্মিলা প্রায় প্রতিটি রামায়ণে উপেক্ষিতা। রামের সীতার প্রতি অমানবিক ব্যবহার দেখে রামের হাতে মুক্তি পাওয়া অহল্যাও ভেবেছে এরকম মানুষের হাতে তার শাপ মুক্তি না ঘটলেই ভালো হত।

লেভি স্ত্রোস মনে করতেন মিথ হল এক ধরনের বাচনভঙ্গি বা কথা, যার মাধ্যমে বিভিন্ন সংস্কৃতির মিল আবিষ্কার করা যায়। অর্থাৎ একই রকম কল্পিত ও আরোপিত কাহিনী বিভিন্ন সংস্কৃতির মধ্যে সাদৃশ্য বহন করে। হোমরের ইলিয়দ ও ওদিসির কল্পিত কাহিনীর সঙ্গে আমাদের রামায়ণের কল্পিত কাহিনীর বেশকিছু মিল আছে, যার ফলে সুদূর অতীতে গ্রিক সংস্কৃতির সঙ্গে ভারতীয় সংস্কৃতির একটা সাদৃশ্য বা মিল গোলাপি কুয়াশার ভেতর দিয়ে চোখে পড়ে। লেভি স্ত্রোস স্ট্রাকচারালিজমের ধারণা অনুযায়ী মনে করতেন মিথের কোন অথেনটিক ভাষা নেই, বরং তা একই ভাষার নানা রূপ। মিথের উৎস খুঁজতে গিয়ে তিনি তাঁর পদ্ধতির নাম দেন মিথেমে (Mytheme)। রামায়ণ এবং ইলিয়দ ও ওদিসির ভাষা ভেঙে ভেঙে আমারা এই মহাকাব্যগুলির নির্মাণ প্রণালীর সম্পর্ক বের করতে পারি। বৈপরীত্য আছে—তা থেকে আমরা বর্তমান আধুনিক সমাজে বিরাজমান আদিম উৎসের প্রতি টান ও বিপ্রতীপ টানের প্রবণতাগুলি খুঁজে পেতে পারি। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির মডার্ন বা পোস্টামডার্ন যুগে প্রবেশ করা সত্বেও কেন আমরা আজও প্রস্তর যুগের ছায়ার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারলাম না? তার একটা অবধারণা পেতে পারি। রামায়ণের কাল হোক বা আধুনিককাল, মৌলিকভাবে মানুষের মনে বাইনারি বৈপরীতের প্রতি ঝোঁক থাকে। রাম মানবোপম হতে চেয়েও হতে পারেন নি—বাইনারি বৈপরীত্যের প্রভাবে। বাল্মিকী রামকে মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মানব প্রতিপন্ন করতে চেয়েও পারেন নি এই বাইনারি বৈপরীত্যের প্রভাবে। মিথের কাজ ম্যাজিক হয়ে ওঠা, বাইনারি বৈপরীত্যের অনুসঙ্গ তৈরি করে ম্যাজিক রিয়ালিজমের জগৎ তৈরি করা অর্থাৎ বিভ্রম বা বিশ্বাস তৈরি করে সমস্যার সমাধান আসে। সাম্প্রতিক কালে জঁ বদ্রিলা যাকে বলেছেন সাদৃশ্যের অনুকৃতির (simulation) জগৎ। যেখানে অনুকৃতি ও প্রতিচ্ছায়ার (image) জগৎ প্রকৃত ঘটনার চেয়ে সত্য হয়ে ওঠে। বাস্তব জগৎটাই আমাদের কাছ থেকে হারিয়ে যায়। টেলিভিশন, ভিডিও, ইন্টারনেটে

দেখা জগতটাকেই প্রকৃত জগৎ মনে হয়। অনেক মিথ্যা ঘটনা সত্যি হয়ে ওঠে, সত্যি ঘটনা মিথ্যা মনে হয়। বদ্রিলা আধুনিক সমাজের ডিসকোর্স নির্মাণে বাস্তবের চেয়ে বাস্তব, যে অতিবাস্তব (hyperreal) এর কথা আমাদের বললেন, রামায়ণ ইলিয়দ-ওদিসির মতো মহাকাব্যেগুলিতেও আমরা এই হাইপাররিয়েল জগতের ছবি পাই। যা পাঠ করার সময় মনে হয় এই অতিবাস্তবের জগৎটাও সত্যি। রাবণ রথে সীতাকে আকাশ পথে উড়িয়ে নিয়ে লঙ্কায় চলে গেলেন। হনুমান এক লাফে সমুদ্র পার হল। রাম তির ছুঁড়ে সমুদ্রের জলকে সরিয়ে দিলেন। মেঘনাদ মেঘের আড়ালে থেকে নাগপাশ ছোঁড়া মাত্র হাজার সাপ বেরিয়ে এল। রামায়ণ পাঠ করার সময় এসব অতিবাস্তব ঘটনা আমরা উপভোগ করি, যেমন সাম্প্রতিক সময়ে টেলিভিশন জগতে যখন প্রবেশ করি নানা সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার কথা ভুলে যাই। একই রকম ঘটনা ঘটে রামায়ণ পাঠে। রামের তূণে যেসব ব্রহ্মাস্ত্র ছিল তা না থাকলে ক্ষেপণাস্ত্র যুদ্ধে রামের পরাজয় সুনিশ্চিত ছিল। সাম্প্রতিক ম্যাজিক রিয়ালিজম উপন্যাসগুলিতে এই হাইপাররিয়েল জগৎ যে বিভ্রম ও বিশ্বাস তৈরি করে, আমরা বুঝতে পারি লেখক ঐ অতিবাস্তব জগৎ-এর ক্যানভাসে আমাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যাগুলি সমাজের সবার কাছে তুলে ধরতে চাইছেন। রামায়ণে বাল্মিকী রামরাজ্যের সব সমস্যার সমাধান করেছেন অতিবাস্তব জগৎ তৈরি করে। হোমরেও প্রায় একই ভাবে ইলিয়দ ও ওদিসি মহাকাব্যের সমস্যার সমাধান করেছেন।

সংস্কৃতি হল চিহ্নের সিস্টেম। রামায়ণের ডিসকোর্স নির্মাণে সমাজতাত্ত্বিক ও নৃততাত্ত্বিক এই চিহ্নের পদ্ধতি ব্যবহার করে, বাল্মিকীর সময় থেকে এ-পর্যন্ত বিনির্মিত অসংখ্য রামায়ণ বা রামকথার নানা তুলনামূলক ব্যাখা বা বিশ্লেষণ করতে পারেন। চিহ্নের পদ্ধতির প্রয়োগে রামায়ণের স্ট্রাকচার থেকে রামায়ণের সময়ের ইতিহাস বেরিয়ে আসতে পারে। চিহ্নের জগৎ তো অবচেতন মনের জগৎ—যে জগৎ থেকে উঠে আসা ঘটনাগুলোকে বাস্তব মনে হয়। অবচেতন মন থেকেই উঠে আসে অন্তর্নিহিত যুক্তি—আর এ জন্যই আজও আমরা রামায়ণ পড়ি ও রামায়ণের এক একটা কাহিনী মেটাফর করে কবিতা-গল্প-উপন্যাস--নাটক লিখে সমসাময়িক সমাজ সমস্যাকে তুলে ধরি। রবীন্দ্রনাথ যেমন রামায়ণের কাহিনী থেকে বাল্মিকী প্রতিভা গীতিনাট্য কাল মৃগয়া বিনির্মাণ করেন। এমনকি রক্তকরবী নাটকেও রবীন্দ্রনাথ রামায়ণের মেটাফর বা রূপক তত্ত্বের দিক থেকে ব্যবহার করতে চেয়েছেন। গ্যাব্রিয়েলা গার্সিয়া মার্কেজও উপন্যাসে এই অবচেতন মন থেকে উঠে আসা অন্তর্নিহিত মুক্তির প্রয়োগ ঘটিয়েছেন লাতিন আমেরিকার রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক সমস্যা তুলে ধরতে। রামায়ণ থেকে ভারতীয় সমাজের একটা সার্বিক সংজ্ঞা তৈরি করা যায়। আধুনিক ভারতীয় সমাজে রামায়ণের ছায়া আজও প্রগাঢ়, ভারতীয় সমাজ ও গণতন্ত্রে আজও রাম।

পরিশিষ্ট-১

শ্রীরামের জন্মবৃত্তান্ত

নন্দিতা ভট্টাচার্য

কৃত্তিবাস তাঁর বাংলা রামায়ণের প্রথম খন্ডে বা আদিকান্ডে শ্রী রামের জন্মবৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করেছেন। আদিকবি বাল্মিকী, তামিল ভাষার কবি কম্বন এবং হিন্দি ভাষার কবি তুলসীদাস যথাক্রমে তাঁদের সংস্কৃত, তামিল এবং হিন্দি রামায়ণের প্রথম খন্ডেই শ্রীরামের জন্মবৃত্তান্ত বর্ণনা করেছেন। তিনটি রামায়ণে প্রথম খন্ডটি 'বালকান্ড' হিশেবে চিহ্নিত।

আদিকবি বাল্মিকী, খোঁজ ছিল একজন আর্দশ মানুষের, যিনি ধর্মজ্ঞ কৃতজ্ঞ ইত্যাদি। নারদ বাল্মিকীকে বললেন অযোধ্যায় রাজা দশরথের পুত্র শ্রীরামের কথা। শ্রীরাম এ সংসারের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব। আর প্রত্যেক মানব জীবনের আকাঙ্ক্ষা নিজেকে সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ হিশেবে প্রকাশ করা।

আদিকবির সূত্র ধরে কৃত্তিবাস, কম্বন, তুলসীদাস সকলেই সেই শ্রীরামকথা পুনর্কথন করেছেন নিজেদের বোধ, বিশ্বাস এবং ফ্রেম অফ রেফারেন্স থেকে। উল্লিখিত প্রত্যেকটি রামায়ণে শ্রীরামের জন্মের অনেক আগে থেকেই বিভিন্ন ঘটনা পরম্পরা এবং স্বর্গীয় ব্যক্তিত্বরা যেমন নারদ, শিব, ব্রহ্মা এমনকি নারায়ণ শ্রীবিষ্ণু নিজে বার বার মনে করিয়ে দিয়েছেন নারায়ণ শ্রীবিষ্ণু এই পৃথিবীতে জন্ম নেবেন। এই বার বার মনে করিয়ে দেবার কারণ হল পৃথিবীতে মানুষ যেন প্রস্তুত থাকে। অপ্রস্তুত কেউ শ্রীরামের জন্ম আকাঙ্ক্ষা করতে পারবে না। শ্রীরামের জন্মের আকাঙ্ক্ষা করা মানে নিজের উত্তরণের জন্য সংগ্রাম শুরু করা। প্রত্যেকটি মানুষের জীবনের সংগ্রামে নিজেকে মানসিকভাবে আরেকটু উন্নত করা। প্রত্যেক মানুষের এই আকাঙ্ক্ষা বা সম্মিলিত আদর্শ রূপ—শ্রীরাম। কিন্তু শ্রীরাম এই সম্মিলিত আকাঙ্ক্ষার নিছক যান্ত্রিক যোগফল নন তার থেকেও বেশি কিছু। একজন রামের মতো আদর্শ মানুষ প্রত্যেকের মনের আলো আঁধারে ছায়া হয়ে থাকেন। মানুষের উন্নত হওয়ার ইচ্ছা এই ছায়াকে আকার দেয় এবং ছায়ারও অভিলাষ হয় নিজেকে প্রকাশ করে মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে তার রূপান্তরে সাহায্যে করা। জন্মের পূর্বের ঘটনাগুলো আমরা দুটি স্তরে রাখতে পারি:

১। স্বর্গ বা মানব উপলব্ধির জগৎ। এখানে ঘটনাগুলি।

অ--গদাধর বা নারায়ণ শ্রীবিষ্ণুর অভিলাষ চার অংশে পৃথিবীতে জন্ম নেবার।

আ--কাশ্যপ অদিতিকে(পৃথিবীতে দশরথ কৌশল্যা) বর প্রদান।

ই--রাবণকে নিধন কারার জন্য, শ্রীবিষ্ণুকে পৃথিবীতে জন্ম নেবার জন্য দেবতাদের অনুরোধ।

২। পৃথিবী বা মানব জীবন--এখানে ঘটনাগুলি :

অ--দশরথের পুত্রলাভের আকাঙ্ক্ষা।

আ--অন্ধক মুনির দশরথকে অভিশাপ। (শুধুমাত্র কৃত্তিবাসে)

ই—মুনি, ঋষিদের রাক্ষসদের অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার ইচ্ছা।

ঈ—গুহক, অহল্যা প্রমুখের শ্রীরামের স্পর্শে মুক্তি আকাঙ্ক্ষা।

অভিজ্ঞতা আসে কর্ম থেকে। পার্থিব জীবন তাই সংগ্রামের—সংঘাতের, যা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করায়। শ্রীরাম জন্মগ্রহণ করবেন। পৃথিবীতে মানুষের সম্মিলিত আকাঙ্ক্ষা আকার পাবে তারজন্য পৃথিবীর কর্ম পরম্পরা(activity) এরকম—

১। অন্ধক মুনির রাজা দশরথকে পুত্র লাভের জন্য শ্রীফল প্রদান।

২। দশরথের পাত্র মিত্র বন্ধু এবং বশিষ্ঠের কাছে পরামর্শ চাওয়া।

৩। এঁদের সকলের অভিজ্ঞতা বিনিময়।

৪। ঋষ্যশৃঙ্গের খবর লাভ।

৫। ঋষ্যশৃঙ্গের অযোধ্যায় আনয়ন।

৬। যজ্ঞের আয়োজন।

৭। রানিদের মধ্যে যজ্ঞচরু বিতরণ।

কৃত্তিবাসী রামায়ণে আমরা দেখি শ্রীরামচন্দ্রের পৃথিবীতে জন্ম নেবার ষাট হাজার বছর আগে বৈকুণ্ঠপুরী (স্বর্গের ভেতর এক জায়গা) স্থির হয়ে গেছে গদাধর লক্ষ্মীসহ রাম লক্ষ্মণ ভরত শত্রুঘ্ন এই চার অংশে অযোধ্যা নগরীতে, সূর্যবংশ রাজা দশরথের ঘরে জন্মাবেন।

রাজা দশরথ সর্বগুণের রাজা রাজচক্রবর্তী। তার তুলনা একমাত্র ইন্দ্র। দশরথের তিন রানি পরমা সুন্দরী। কৌশল্যা, কৈকেয়ী আর সুমিত্রা তাঁর প্রধান তিন রানি। দশরথ তবু কিন্তু দুঃখী। কারণ তিনি পুত্রহীন রাজা দশরথ—

পাত্রমিত্র ভাই বন্ধু সবাকারে আনি।
বশিষ্ঠাদি আনাইলে যত মুনি জ্ঞানি।।
সভা কবি বসে রাজা অমত্য সহিতে।
অতি খেদ করি রাজা লাগিল কহিতে।।
ইহকালে না হইলে আমার সন্ততি।
পরকালে কিরূপ পাইব অব্যহতি।।

স্বর্গে সমস্ত দেবতারা শ্রীবিষ্ণুর শরণাপন্ন। কারণ পৃথিবীতে লঙ্কার রাজা রাবণ ব্রহ্মার বরে অমিত শক্তির অধিকারী, অপরাজেয়। সমস্ত দেবতাদের তাঁর লঙ্কায় দাস করে রেখেছে। একথা শুনে শ্রীবিষ্ণু বললেন....

ভয় নাহি আর।
রাবণেরে এখনি যে করিব সংহার।।

কিন্তু ব্রহ্মার বরে অপরাজেয় রাবণের মৃত্যু একমাত্র নর এবং বানরের হাতেই হতে পারে। নারায়ণ বিষ্ণুকে তাহলে নররূপ ধারণ করতে হবে—মানব সন্তান হয়ে জন্মগ্রহণ করতে হবে।

বিষ্ণু বললেন—

কতবার দুঃখ পাব ললাট লিখন।
পৃথিবীতে যাব স্বর্গ করিয়া ত্যাজন।।

শ্রীবিষ্ণু মানব জন্ম নিতে আগ্রহী নন। যদিও এই বিষ্ণু গদাধরই এর অনেক আগে অভিলাষ করেছিলেন মর্তে চার অংশে জন্ম নেবেন।

তুলসীদাসী রামায়ণে বা কম্ব রামায়ণে নারায়ণের মধ্যে এই টানাপোড়েন নেই। এই দুই জায়গায় নারায়ণ সোজাসুজি আশ্বস্ত করেছেন এবং বলেছেন রাবণকে নিধন করার জন্য খুব শ্রীঘ্র তিনি মানবরূপ ধারণ করবেন দশরথের ঘরে। তুলসীদাসী রামায়ণে আছে কাশ্যপ অদিতি নারায়ণকে পুত্ররূপে পাওয়ার জন্য অনেক কৃচ্ছসাধন করেছিলেন। নারায়ণ তাই তাদের আর্শীবাদ করেছিলেন এই পৃথিবীতে তাঁদের পুত্ররূপে অবতরণ করবেন বলে। কাশ্যপ অদিতি অযোধ্যা নগরীতে দশরথ কৌশল্যা। তাঁদের ঘরে নারায়ণ চার অংশে জন্ম নেবেন।

কম্ব রামায়ণে নারায়ণ বলেছেন তিনি জন্ম নেবেন। তাঁর অনন্য শেষনাগ শয্যা, তাঁর শঙ্খ, চক্র তাঁর ভাই হিসেবে তাঁর সঙ্গে এই পৃথিবীতে জন্ম নেবেন তাঁর নির্দেশ পালনের জন্য।

কৃত্তিবাস রামায়ণে নারায়ণ দেবতাদের রাবণের হাতে অসম্মানিত হবার কথা শুনে পৃথিবীতে অবতরণ করবেন স্থির করলেন। তাই বিষ্ণু প্রশ্ন করলেন ব্রহ্মাকে—

হে ব্রাহ্মণ ইহার উপায় বল মোরে।
কোন বংশে জন্ম লব বল কার ঘরে।।
কাহার উদরে আমি লইব জনম।
আমারে বা অপত্য বলিবে কোন জন?

ব্রহ্মা তখন তাঁকে বললেন দশরথের ঘরে কৌশল্যার গর্ভে শ্রীবিষ্ণু জন্ম নেবেন। চক্রপাণি বিষ্ণু বললেন, দশরথ কৌশল্যা উভয়কেই তিনি জানেন।

পূর্বেতে আমার সেবা করিছে বিস্তর।
জন্মিব তোমার ঘরে দিয়েছি এই বর।।

শ্রীরাম পৃথিবীতে শুধু জন্মবার জন্যেই জন্মাবেন না। তাঁর বিশেষ কিছু উদ্দেশ্য আছে।

অত্যাচারিত রাবণকে সংহার করাই তার প্রথম এবং প্রধান উদ্দেশ্য। শ্রীরাম জন্মালে রাক্ষস নিধন হবে। পৃথিবীতে মুনি ঋষিরা নির্বিঘ্নে যজ্ঞ সম্পাদন করতে পারবেন। তাছাড়া শ্রীরামের স্পর্শে মুক্ত হবে গুহক চন্ডাল, অহল্যা আরো অনেকে। দশানন রাবণ রাক্ষস—মানব মনের দশমাথা--প্রলোভনের সাপ। অযোধ্যার রাজা দশরথের শব্দভেদী বাণে অন্ধক মুনির পুত্র সিন্ধুর মৃত্যু হয়েছিল। অন্ধক মুনি পৃথিবীতে দেখতে পান না—অন্তমুর্খী। তাঁর কোন কর্ম নেই। পুত্রের মৃত্যুর পর রাজা দশরথের সঙ্গে তার কথোপকথনের মাধ্যমে বাইরের পৃথিবীতে সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ স্থাপন হচ্ছে। অন্ধক মুণি রাজাকে অভিশাপ দেন—

আর কিবা দশরথ শপিব তোমাকে।
এইমত তব প্রাণ যাক পুত্রশোকে।

দশরথ অভিশাপকে বর ভেবে নিলেন কারণ, তিনি পুত্রহীন। তাহলে তিনি নিশ্চই পুত্রবান হবেন। পুত্র লাভের আকাঙ্ক্ষায় গুরু বশিষ্ঠের কাছে গিয়ে তিনি বললেন—

বর দিয়াছেন অন্ধক মহামুনি।
যজ্ঞ কর তুমি ঋয্যশৃঙ্গ মুণি আনি।।

তখন বশিষ্ঠ্য ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির জন্মবৃত্তান্ত বর্ণনা করলেন। ঋষ্যশৃঙ্গের জন্ম হরিণীর গর্ভে। তাঁর বাবা কাশ্যপ মুনির পুত্র বিভাণ্ডক। কম্ব রামায়ণের কম্বন শ্রীরামের জন্ম বৃত্তান্ত উল্লেখ করতে গিয়ে ঋষ্যশৃঙ্গ মুণির কথা বলেছেন। কিন্তু সেখানে ঋষ্যশৃঙ্গের বাবা হিসেবে বলা হয়েছে কাশ্যপ মুনিকে। তুলসীদাস তাঁর রামায়ণে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে বলেছেন শৃঙ্গী মুনি। আদিকবি বাল্মিকী ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির কথা উল্লেখ করেছেন।

ঋষ্যশৃঙ্গ পরম পবিত্র। পৃথিবীর কোন ভেদাভেদ তিনি জানেন না। কারণ তিনি মানব সমাজ থেকে দূর এক জঙ্গলে তাঁর পিতার সঙ্গে সাত্ত্বিক জীবন যাপন করেন—কৃচ্ছ সাধন করেন। তিনি এমনকি নারী পুরুষের ভেদাভেদও বোঝেন না। পরম সুন্দর ঋষ্যশৃঙ্গ ধীরে ধীরে বড় হয়ে ওঠেন।

পরম সুন্দর সে বিভাণ্ডকের বেটা।

শাস্ত্র বেত্তা হয় সে কপালে শৃঙ্গ ফোঁটা।।

শৃঙ্গ কি শৃঙ্গারের কথা মনে পড়ায়? শৃঙ্গ কি পুরুষাঙ্গের প্রতীক?

ঋষ্যশৃঙ্গ এলে অনাবৃষ্টিতে মৃতপ্রায় লোমপাদ রাজার দেশ অঙ্গরাজ্যে বৃষ্টি হবে। পরম পবিত্র ঋষ্যশৃঙ্গের পাদস্পর্শে অঙ্গরাজ্য পাপমুক্ত হবে। অঙ্গরাজ্য প্রাণের স্পন্দন ফিরে পাবে। সুমন্ত্র রাজা দশরথের কাছে অঙ্গদেশের পাপমুক্তির আখ্যান বর্ণনা করলেন। শুনে দশরথ ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে আনতে অঙ্গরাজ্যের উদ্দেশে রওনা হলেন। অঙ্গরাজ্যের রাজা লোমপাদ দশরথকে পরম সমাদরে বরণ করলেন। রাজা দশরথ বললেন--

শুন মোর বাণী।

অযোধ্যায় লয়ে চল ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি।।

অন্ধকের উক্তি আছে যে অতীতকালে।

পুত্রবান হব আমি ঋষ্যশৃঙ্গ গেলে।।

রাজা দশরথ অপুত্রক কিন্তু তার এক কন্যাসন্তান আছে। তার নাম শান্তা। লোমপাদের ঘরে সে বড় হয়েছে। লোমপাদ ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির সঙ্গে তার বিবাহ দিয়েছেন। সুতরাং কৃত্তিবাসী রামায়ণে রাজা দশরথ ঋষ্যশৃঙ্গের শ্বশুর। লোমপাদ বললেন—

শান্তা কন্যা বিবাহ যে দিয়েছি তোমারে।

সেই কন্যা জন্মেছিলো ইহার আগরে।।

ইহার জামাতা তুমি তোমার শ্বশুর।

অপুত্রক তাপিত এ তাপ কর দূর।।

তখন ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি ধ্যানযোগে জানতে পারলেন নারায়ণ শ্রীবিষ্ণু চার অংশে জন্ম নেবেন দশরথের ঘরে। সুতরাং খুশিমনে ঋষ্যশৃঙ্গ রাজা দশরথের সঙ্গে অযোধ্যায় গমন করলেন, বললেন—

.....কর যজ্ঞ আরম্ভন।

অশ্বমেধ যজ্ঞ কর বিষ্ণু আরাধন।

বাল্মীকি রামায়ণে দশরথ অশ্বমেধ যজ্ঞ করছেন। রানি কৌশল্যা অশ্বর সঙ্গে নিশি যাপন করছেন। অশ্ব আশ্বিন ভাতৃদ্বয়ের সঙ্গে অনুষঙ্গযুক্ত, যাঁরা সূর্যের প্রতীক। অশ্ব তাই সূর্য

প্রতীকের সঙ্গে যুক্ত। অশ্বমেধ যজ্ঞে রাজাদের মধ্যে যিনি সূর্যসম তিনি অশ্ব বলি দেন। রাম সূর্য বংশে জন্মেছেন। কৌশল্যা অশ্বের পুরুষাঙ্গ নিয়ে রাত্রি অতিবাহিত করেছেন। সূর্যশক্তি তাঁকে উর্বর করবে। তাঁর সন্তান পাবে সূর্যের অমিত রূপ। অশ্বমেধের পর আবার প্রজ্জ্বলিত হল অগ্নি। শুরু হল পুত্রেষ্টি যজ্ঞ। ঋষ্যশৃঙ্গ তাঁর ঋত্বিক।

কম্ব রামায়ণে বশিষ্ঠ দশরথকে বলেছেন, রাজা দুঃখ কোর না। যাও ঋষ্যশৃঙ্গের পৌরহিত্যে পুত্রকামেষ্টি যজ্ঞ কর। তুমি পুত্রবান হবে। বশিষ্ঠ এখানেও দশরথকে ঋষ্যশৃঙ্গের আখ্যান বর্ণনা করেছেন। বালক সন্ন্যাসী ঋষ্যশৃঙ্গ রোমপাদের (কৃত্তিবাসে এই ইনি লোমপাদ) রাজত্বে পা রাখতেই শিবের গলার রঙের মতো গাঢ় মেঘ আকাশ ছেয়ে ফেলল। মুষলধারে বৃষ্টি সমস্ত পুকুর নদী ভর্তি করে সমস্ত রাজ্য ভিজিয়ে দিল। সকলে আনন্দিত। রোমপাদের রাজ্য যেন উপোষী এক নারী। পুরুষ ঋষ্যশৃঙ্গ তাকে উর্বর করল। রোমপাদ তার কন্যা শান্তার সঙ্গে ঋষ্যশৃঙ্গের বিবাহ দিলেন। সেই ঋষ্যশৃঙ্গ দশরথের জন্য যজ্ঞ করবেন।

তুলসীদাসী রামায়ণে গুরু বশিষ্ঠ শৃঙ্গী মুনিকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হবার জন্য। দশরথের পুত্রলাভের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করছেন তিনি। যজ্ঞের আগুন প্রজ্জ্বলিত হল। সমগ্র বিশ্বসংসারের মুনিরা আমন্ত্রিত হলেন--

অগস্ত্য অগস্ত্য আর পুলস্ত পুলোম।
আইলেন বৈশাম্পায়ন দুর্ব্বাসা গৌতম।।
জৈমিনী গৌতম পিপীলিকা পরাশর।
পুলহ কৌন্ডিণ্য মুনি এল নিশাকর।।.....
তিনকোটি মুনি--কৃচ্ছসাধনই যাদের ব্রত। ঈশ্বর নিবেদিত প্রাণ যাঁদের—
নারায়ণের কথা বিনা মুখে নাহি আন।

শিষ্যসহ এই তিনকোটি মুনি সমস্বরে বেদমন্ত্র উচ্চারণ করলেন। কোটি মানুষের মনের ইচ্ছা একত্রিত হল। শ্রীরাম জন্ম নেবেন।

কম্ব রামায়ণে রাজা দশরথ তাঁর রাজরথ থেকে নেমে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির পাদস্পর্শ করছেন। ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি রাজা দশরথকে আর্শীবাদ করছেন তুমি পুত্রবান হবে। তোমার পুত্র পৃথিবীসহ চোদ্দালোকের রাজা হবে। যজ্ঞ শুরু হল। এল হাল এবং চাষের যন্ত্রপাতি। প্রস্তুত হল উৎসর্গের নৈবিদ্য। হাল fertility-র প্রতীক। হাল দিয়ে জমি চাষ করা হয়। হাল পৌরুষ। স্ত্রী জমি, উর্বর করে হাল।

তিনটি আলোক শিখা প্রজ্জ্বলিত হল। ছয় মাস ধরে জ্বলতে লাগল অনির্বাণ সেই শিখা। তিনটি শিখা স্বত্ত্বঃ রজো তমঃ এই তিনটি গুণ পুড়লে কি ঈশ্বর অবতরণ করবেন? সারা আকাশ জুড়ে দেবতারা বসে। দেবতারা অবলোকন করছেন ঋষ্যশৃঙ্গের যজ্ঞ। কারণ শ্রীরাম জন্ম নেবেন। দশানন রাবণের সংহার হবে। সকলে মুক্তি পাবে।

গুরু বশিষ্ঠ রাজা দশরথকে যজ্ঞ করতে বলেছেন যজ্ঞের মাধ্যমে দশরথ পুত্রবান হবেন। তার মানে দশরথ কি ইমপোটেন্ট? কৃত্তিবাসী রামায়ণে এই যজ্ঞ চলল এক বছর ধরে। যজ্ঞস্থলে নারায়ণ আর্বিভূত হলেন। তাঁকে দেখতে পেলেন কেবল ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি। ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি বললেন,

.....দশরথ তুমি পুণ্যবান।
তব ঘরে জন্মিতে আইল ভগবান।।
ঋষ্যশৃঙ্গ যজ্ঞে আহুতি দিলেন। চরুতে ফেলা হল অন্ধক মুনি প্রদত্ত শ্রীফল।

কম্ব রামায়ণে দেখি যজ্ঞস্থলে যজ্ঞের আগুন থেকে উঠে এল এক রক্তচক্ষু দেবতা, অগ্নিবর্ণ কেশরাশি। হাতে তাঁর স্বর্ণ থালায় একমন্ড মিষ্টি, দেবভোগ্য ভাত।

তুলসীদাসী রামায়ণে দেখা যায় যজ্ঞে পবিত্র আহুতির সঙ্গে সঙ্গে অগ্নিদেব পায়েসের পাত্র হাতে আগুনের ভেতর থেকে আসছেন। যজ্ঞের আগুন থেকে উৎসারিত চরু বা মিষ্টি ভাতের মন্ড পায়েস কীসের প্রতীক? বীর্য?

কৃত্তিবাসী রামায়ণে রাজা দশরথ এই চরু বা পায়েস মাথায় করে সুপবিত্র পথ দিয়ে অন্তঃপুরে গেলেন। এই চরু দুইভাগে তাঁর প্রধান রানি কৌশল্যা এবং কৈকেয়ীকে দিলেন, কারণ সুমিত্রা অভিশপ্তা। বিয়ের পর কালরাত্রিতে স্বামীসঙ্গ করায় সে সবচেয়ে সুন্দরী হয়েও দুর্ভাগা, স্বামীসঙ্গ বঞ্চিতা। সুমিত্রা চরুর ভাগ না পেয়ে কাঁদতে কাঁদতে কৌশল্যার কাছে গেল—

কৌশল্যা রানি হয়েও দয়াবতী।
বলিতে লাগিল রানি সুমিত্রার প্রতি।।
আপনভাগের তোমা দিব অর্দ্ধখানি।

এই থেকে সুমিত্রার যে সন্তান জন্মাবে সে সবসময় রামের সঙ্গে থাকবেন। সেই দেখে কৈকেয়ী সুমিত্রাকে তার চরুর একাংশ দিয়ে বললেন:

আমার চরুর অংশে হবে যে নন্দন।
আমার পুত্রের সঙ্গী কর সেইজন।।

এইভাবে এক অংশ নারায়ণ চার অংশ হয়ে তিন রানির গর্ভে শুভক্ষণে জন্ম নিলেন। পুত্রেষ্টি যজ্ঞ সাঙ্গ হলে সব আমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ, মুনি রাজাকে আর্শীবাদ করলেন 'হও পুত্রবান'।

চরু ভক্ষণের পর তিন রানি তাঁদের প্রথম বয়সে ফিরে গেলেন। আস্তে আস্তে তাঁদের শরীরে পরিবর্তন এল এবং অবশেষে দশমাস বাদে প্রথম জন্ম নিলেন কৌশল্যার গর্ভে রাম তারপর কৈকেয়ীর গর্ভে ভরত এবং সুমিত্রার গর্ভে দুই সন্তান লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্ন। রামের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে লঙ্কায় রাবণের সিংহাসনে দুলে উঠল, মাথা থেকে খসে পড়ল রাজমুকুট। আয়রনিক্যালি দশাননের মৃত্যু ঘোষিত হল।

কম্ব রামায়ণে রাজা দশরথ মিষ্টি দেবভোগ্য ভাতের মন্ডের প্রথম ভাগ দিলেন কৌশল্যাকে দ্বিতীয় ভাগটি দিলেন কৈকেয়ীকে এবং তৃতীয় ভাগ সুমিত্রাকে দেওয়ার পরও হাতের চেটোয় যেটুকু উদ্বৃত্ত ছিল সেটুকু দিলেন সুমিত্রাকে। এবং সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্র স্বর্গে আনন্দে চিৎকার করে উঠলেন—আমার শত্রুর সংহার অবধারিত। কারণ নারায়ণের চার অংশের জন্মাবার প্রস্তুতি নিশ্চিত হল। কিছুদিনের মধ্যে তিন রানির সমস্ত শরীর চাঁদের মতো হয়ে উঠল।

তুলসীদাসী রামায়ণে রাজা দশরথ পায়েসের প্রথম ভাগ দিলেন কৌশল্যাকে। অবশিষ্ট পায়েস দুই ভাগ করে এক অংশ দিলেন কৈকেয়ীকে। অবশিষ্ট অংশটি আবার দুটিভাগে ভাগ

করে কৌশল্যা এবং কৈকেয়ীর সম্মতিক্রমে সুমিত্রার হাতে তুলে দিলেন। এইভাবে তিন রানিরই গর্ভ সঞ্চারিত হল। নারায়ণ জন্ম নিলেন চার অংশে। রাম,ভরত, লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্ন। সারা বিশ্বসংসার আনন্দে ভরে উঠল। কারণ রাবণ-দশানন নিধন হবে। দশানন আসলে মানব মনের গভীরে লুকিয়ে থাকা দশমাথা প্রলোভনের সাপ যাকে জয় করাই মানব জীবনের লক্ষ্য। রামের জন্ম আসলে সমস্ত মানুষের বা দেবতাদের(যারা খুব সহজেই আবদ্ধ হয়ে পড়েন) সম্মিলিত মুক্তির ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষার প্রক্ষেপ। স্বর্গে স্থির হয়ে ছিল নারায়ণ জন্ম নেবেন। আমাদের মনের গভীর গভীরতর প্রদেশে রোজ ধর্মজ্ঞ কৃতজ্ঞ মানুষের জন্ম হয়, যে আমাদের মনের রাবণকে মারতে সাহায্য করতে চায়। কিন্তু অপ্রস্তুত আমরা সেই মানুষটির সঙ্গী হতে পারি না।

পরিশিষ্ট-২

রামায়ণ: মডার্ন, পোস্টমডার্ন ও মার্কসবাদী পাঠকৃতি

সুরয যোশী

মডার্ন চোখে কম্ব রামায়ণ

আর . কে. নারায়ণ একজন প্রখ্যাত ভারতীয় ঔপন্যাসিক। তিনি একটি রামায়ণ লিখেছেন। তাঁর রামায়ণ লেখার উৎস তামিল কম্ব রামায়ণ। বাল্মিকী রচিত রামায়ণের অসংখ্য পাঠকৃতির একটি তামিল ভাষায় রচিত কম্ব রামায়ণ। বাল্মিকী সংস্কৃত ভাষায় রামায়ণ লেখেন ২৪০০০ স্তবকে। কম্ব রামায়ণে ১০৫০০স্তবক আছে। কম্বন সুপ্রাচীন দ্রাবিড় ভাষার শাখা তামিল ভাষায় রামায়ণটি রচনা করেন নিজের মতো করে। আর .কে. নারায়ণ সেই তামিল রামায়ণ পাঠ করে তাঁর নিজের ভাষ্যে The Ramayana রচনা করেন। কম্ব রামায়ণ রচনাকাল ১১ শতাব্দীতে। আর. কে. নারায়ণ লিখছেন ২০ শতাব্দীতে ইংরেজি ভাষায়। বাল্মিকী বা কম্ব রামায়ণ কবিতার ফর্মে লেখা। আর.কে. নারায়ণের The Ramayana গদ্য ফর্মে লেখা। আর. কে. নারায়ণ কম্ব রামায়ণ অনুবাদ করেননি, এমনকি এটি কোন গবেষণাধর্মী লেখাও না। প্রখ্যাত ঔপন্যাসিকের মনে কম্ব রামায়ণ পাঠের যে প্রতিফলন ঘটেছে তারই নির্যাস নিয়ে আর. কে. নারায়ণ কম্ব রামায়ণের নতুন পাঠকৃতি রচনা করেছেন। কম্বন–এর ভাষা, দৃষ্টিভঙ্গি, চরিত্রায়ণ ও ঘটনা বিন্যাসের নাটকীয়তা তাঁকে যেভাবে প্রভাবিত করেছে–সেভাবেই তিনি একটি নতুন রামায়ণ গদ্য শৈলীতে প্রকাশ করেছেন। আর. কে. নারায়ণের রামায়ণও উপন্যাস পাঠের মতো সুখপাঠ্য। তাঁর রামায়ণে প্রস্তাবনার আগেই নাটকে যেমন চরিত্রদের নাম থাকে সেভাবেই পাত্র পাত্রীদের একটি তালিকা দিয়েছেন, অর্থাৎ তাঁর রামায়ণ যাঁদের নিয়ে রচিত সেইভাবে পাত্র পাত্রীদের পরিচয় আগে ভাগেই দিয়ে দিচ্ছেন: দশরথ, কৌশল্যা, কৈকেয়ী, সুমিত্রা, সুমন্ত্র, তারা, হনুমান, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, কুম্ভি, জনক, সীতা, সূর্পনখা, জটায়ু, সম্পাতি, বালী, সুগ্রীব, জাম্বুবান, তাড়কা, রাবণ, বিভীষণ, কুম্ভকর্ণ, ইন্দ্রজিৎ, মন্দোদরী, গৌতম, ভাগিরথী, মহাবলী ও মহাবিষ্ণু। এরপর সমগ্র রামায়ণকে চোদ্দটি অধ্যায়ে ভাগ করেছেন: Rama's Initiation, The Wedding, Two Promises Revived, Encounter in Exide, The Grand Tormentor, Vali, When the Rains Cease, Memento from Rama, Ravana in council, Across the Ocean, The Siege of Lanka, Rama and Ravana in battle, Interlude, The Coronation.

Prologue যেমন আছে, Epilogue-ও আছে। এক পৃষ্ঠার Glossary-ও আছে। আর. কে. নারায়ণের Malgudi উপন্যাস যাঁরা পড়েছেন–তাঁরা জানেন ইংরেজি ভাষায় তিনি কত প্রাঞ্জল ও স্বচ্ছ। এখানে রামায়ণের পাত্র পাত্রীর চরিত্র চিত্রণেও তিনি মুন্সীয়ানা দেখিয়েছেন। প্রতিটি চরিত্র নির্মাণ করেছে নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে। তাঁর রামায়ণে মিথিলার বর্ণনা একইরকম : Mithila, after all the forests, mountain paths, valleys, and places of solitude and silence through which we have travelled thus far, offers a pleasant change to a city of colour and pleasure, with people enjoying the business of living.

The very minute Rama steps into Mithila, he notices golden turrets and domes. and towers. and colourful flags fluttering in the wind as if to welcome a royal bridegroom-to-be. The streets glitter with odds and ends of jewellery cast of the people (a necklace that had snapped during a dance or a game, or had been flung of when found to be nuisance during an embrace), with no one inclined to pick them up in a society of such affluence. There was no charity in Kosala country since there was no one to receive it. Torn-off flower garlands lay in heaps on the roadside with honey-bees swarming over them. The musth running down the haunches of mountainous elephants flowed in dark streams along the main throughfare, blending with the white froth dripping from the mounths of galloping horses, and churned with mud and dust by ever-turning chariot wheels. এ বর্ণনা আর. কে. নারায়ণের নিজস্ব ভাষা শৈলী। মর্ডান-চোখে দেখা কোন প্রাচীন ঐতিহাসিক শহর। যে শহর ভাসমান সাররিয়ালিস্টিক জগতে।

রাবণের দরবার হলের বর্ণনা :

Ravana. the supreme lord of this and other worlds, sat in his durbar hall, surrounded by a vast throng of courtiers and attendants. The kings of this earth whom he had reduced to vassaldom stood about with their hands upraised in an attitude of perpetual salutation, lest at any moment Ravana should turn in their direction and think that they were not sufficiently servile. Beauties gathered from all the worlds surrounded him, singing, dancing. ministering to his wants, ever ready to give him pleasure and service, with all their eyes fixed on his watching for the slightest sign of command. Every minute vast quantities of flowers were rained on him by his admirers. He had also ensalved the reigning gods and put them to perform menial tasks in his court. Among them Vayu, the god of wind, was there to blow away faded flowers and garlands. and generally sweep the hall clean, Yame. the god of death, was employed to sound the gong each hour to tell the time of day. The god of fire was in charge of all illumination and kept lamps, incense, and camphor flames alit. The Kalpataru, the magic tree that yielded any wish, taken away from Indra, was also there to serve Ravana. এ বর্ণনারও ভিস্যুয়াল-এফেক্ট মারাত্মক। কেউ যদি রামায়ণ নিয়ে চলচ্চিত্র করতে চান, আর. কে. নারায়ণের এ-লেখাতেই চিত্রনাট্য প্রস্তুত।

রাম-রাবণের যুদ্ধের বর্ণনা:

Rama's army cleared and made way for Ravana's chariot, unable to stand the force of his approach. Ravana below his conch and its shrill challenge reverberated through space. Following it another conch, called "Panchajanya," which belonged to Mahavishnu (Rama's original form before his present incarnation), sounded of its own accord in answer to the challenge, agitating the universe with its vibrations. And then Matali picked up another conch. which was Indra's and blow it. This was the signal indicating the commencement of the actual battle. Presently Ravana sent a shower of arrows on Rama; Rama's

followers, unable to bear the sight of his body being studded with arrows, averted their heads. Then the chariot horses of Ravana and Rama glared at each other in hostility, and the flags topping the chairots– Ravana's ensign of the Veena and Rama's with the whole universe on it– clashed and one heard the stringing and twanging of bow-strings on both side. overpowering in volume all other sound. Then followed a shower of arrows from Rama's own bow. Ravana stood gazing at the chariot sent by Indra and swore. "These godes, instead of supporting me, have gone to the support of this petty human being. I will teach them a lesson. He is not fit to be killed with my arrows but I shall seize him and his chariot together and fling them into high heaven and dash them to destruction." despite his oath, he still strung his bow sent a shower of arrows at Rama, raining in thousands, but they were all invariably shattered and neutralized by the arros from Rama's bow, which met arrow for arrow. Ultimately Ravana, instead of using one bow, used ten with his twenty arms, multiplying his attack tenfold; but Rama stood unhurt.

আর. কে. নারায়ণ রামায়ণ শেষ করেছেন একেবারে আধুনিক উপন্যাসের মতো: রাম চোদ্দো বছর বনবাসে কাটিয়ে অযোধ্যা ফিরে এসেছেন, ইতিমধ্যেই তিনি অশুভ শক্তির হাত থেকে পৃথিবীকে মুক্ত করেছেন। অযোধ্যায় আনন্দের মুহূর্ত ফিরে এসেছে। রামের বন্ধুরা দেখা করতে এসেছেন। হনুমান, সুগ্রীব ও কিষ্কিন্ধ্যার অন্যান্যরা মানবদেহে উপস্থিত। রাম তাঁর মায়েদের দ্বারা পরিবৃত, এমনকি কৈকেয়ীও উপস্থিত। পৃথিবীর যত রাজারা ও দেবতারাও মানবদেহে উপস্থিত। বিভীষণ এখন লঙ্কার রাজা--রামের বিশেষ অতিথি। ভরত এতদিনে মনে শান্তি ফিরে পেয়েছেন। ভাই রাম এবার অযোধ্যার সিংহাসনে বসবে। দুঃখ-কষ্টের সময় বিদায় নিয়েছে। অবসান হয়েছে শোকের। শুভক্ষণে রাম অযোধ্যার সিংহাসনে অরোহন করলেন, তাঁর পাশের সিংহাসনে সীতা। লক্ষ্মণ পাশেই দাঁড়িয়ে, হনুমান পায়ের কাছে হাঁটু গেড়ে প্রার্থনার ভঙ্গিতে যেকোন নির্দেশের অপেক্ষায়। রামের সিংহাসনে আরোহণের মধ্যেই রামায়ণ শেষ। কম্ব রামায়ণ অযোধ্যায় রামের ফিরে আসা ও সুখী জীবনের স্বপ্ন নিয়েই শেষ হয়েছে। আর. কে. নারায়ণ কম্বর পথই অনুসরণ করেছেন। আর. কে. নারায়ণের রামায়ণ সাহিত্যগুণ সমৃদ্ধ। তাঁর *The Ramayan* পাঠ করে যে কোনো পাঠক আধুনিক উপন্যাস পাঠের অভিজ্ঞতা অর্জন করবেন।

পোস্টমডার্ন চোখে বাল্মিকী রামায়ণ

শিল্প ও সাহিত্য সৃষ্টির যে কোন কাজেই সময় এক বিশেষ ভূমিকা নিয়ে থাকে। রামায়ণ সম্পর্কে আমরা যে তথ্য এ-পর্যন্ত পাই তা থেকে ধরে নেওয়া হচ্ছে রামায়ণ খৃষ্ট পূর্ব তৃতীয় বা দ্বিতীয় শতক থেকে শুরু করে খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকের মধ্যে লেখা অর্থাৎ রামায়ণ তার পরিপূর্ণ রূপ পেয়েছে প্রায় ৬০০/ ৭০০ বছর ধরে বিভিন্ন চারণ কবির রামকথার মধ্যে দিয়ে। মূল রামায়ণ, যেটিকে আমরা বাল্মিকী রামায়ণ বলছি তা খৃষ্টীয় প্রথম শতকের মধ্যে লেখা পন্ডিতদের অনুমান। রামায়ণ কোন ইতিহাস না, মহাকাব্য--যে মহাকাব্যে প্রতিফলিত এই ৬০০-৭০০ বছরের সমাজজীবনের চিত্র। কিন্তু রামায়ণ এমন একটি মহাকাব্য যা তার সৃষ্টিকাল থেকে এই

একবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত ভারতীয় সমাজজীবনের বিভিন্ন পর্বের আশা—আকাঙ্ক্ষা-ভয় ও আশঙ্কাকে ধারণ করেছে। এই সুদীর্ঘ ২০০০ বছর ধরে বাল্মিকী রামায়ণ-এর পাঠকৃতি থেকেই ভারতীয় শিল্প-সাহিত্য-চিত্রকলা-স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের নানা নির্মাণ সৃষ্টি হয়েছে। প্রতিটি যুগ তার নিজস্ব ভাষার বয়ানে সৃষ্টি করেছে নতুন নতুন রামায়ণ। এ. কে. রামনুজন আমাদের ৩০০-র বেশি রামায়ণ বিনির্মাণ-এর কথা জানিয়েছেন। কেউ কেউ মনে করেন ১০০০-এর বেশি রামায়ণ আছে। রামায়ণের নতুন নতুন পাঠকৃতি আজও অপ্রতিহত গতিতে বহমান।

ড. রমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় রামায়ণ-এর একজন তন্বিষ্ট গবেষক। বাল্মিকী রামায়ণের নান্দনিক অভিপ্রায় নিয়ে তিনি মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করেছেন। এই মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে তিনি স্ট্রাক্চারালিজমের সাহায্য নিয়েছেন। পোস্টমডার্ন পাঠকৃতির আলোয় নতুনভাবে বাল্মিকীর রামায়ণ তিনি পাঠ করেছেন। বাল্মিকী রামায়ণের এসথেটিক দিকটিই তাঁর আলোচনা ও বিশ্লেষণে প্রধান স্থান পেয়েছে।

রামায়ণ শুধুমাত্র মহাকাব্য না। রামায়ণ ভারতীয় গণমানসের আত্মার প্রতীক। রামায়ণ একটি রোমান্স। রাম-এর মতো বীরের কাহিনী এখানে বলা হয়েছে। রাম-সীতার প্রেমের গল্প। রামায়ণ শুরু হয়েছে মিথুনরত ক্রৌঞ্চের মৃত্যু-বিলাপে। রামায়ণ শেষ হয়েছে আহত, অপমানিত সীতার পাতাল প্রবেশে। প্রেমের চেয়ে বড় হয়েছে রাজধর্ম। অথচ প্রেমই ধ্বংস করেছে রাবণের সোনার লঙ্কা! একের পর এক প্রেমের ঘটনা রামায়ণে বিস্তৃত। মানবজীবনের নানা-সমস্যা নিয়েই রামায়ণ। রাম-সীতা-লক্ষ্মণ-এর আর্কিটাইপ আজও ভারতীয় শিল্প—সাহিত্যের নানা মাধ্যম নিয়ন্ত্রণ করছে। চলচ্চিত্র, টেলিভিশনের মতো আধুনিক মাধ্যমগুলিও রামায়ণ প্রভাবিত। রামায়ণের চরিত্রগুলির অর্কেটাইপ সম্পৃক্ত। ড. রমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এ-রকম একটি মহাকাব্যের পাঠকৃতি মাত্র ১৪৮ পৃষ্ঠার Valmiki Ramayana Reconsidered-এ-এত প্রাঞ্জল ও স্বচ্ছভাবে আমাদের কাছে উপস্থিত করেছেন যা মুগ্ধচিত্তে পাঠ করতে হয়। সম্পূর্ণ বইটিকে তিনি বারোটি অধ্যায়ে সাজিয়েছেন ১. মনস্তত্ত্ব ও সাহিত্য ২. বাল্মিকীর গল্প—সৃজনধর্মী পদ্ধতি ৩. ইগোর জন্ম—রামের জন্ম: বালকান্ড ৪. ইগোর সঙ্গে উপকারী সুপারইগোর সাক্ষাৎকার—রামের শৈশব; বালকান্ড ৫. যৌবনে ইগো—রামের যৌবন: অযোধ্যাকান্ড ৬. ইগোকে ইডের আঘাত—রামের যৌবন: রাম: কিষকিন্ধ্যা কান্ড ৮. ইগোর ইড তৃষ্ণা—যৌবনে রাম: সুন্দরকান্ড ৯. ইডের সঙ্গে ইগোর লড়াই—যৌবনে রাম: যুদ্ধ কান্ড ১০. চতুর্মুখী মৃত্যুর মুখোমুখি ইগো—রাম পরিপূর্ণ মানুষ: উত্তরাকান্ড ১১. বাল্মিকীর গল্প ১২. রামায়ণের বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি।

ডুর্কহেইম কথিত সামাজিক সংহতির অরগ্যানিক ভিত্তি বাল্মিকী রচিত রামায়ণ। বাল্মিকী রামায়ণ সংস্কৃততে রচিত। যা সাধারণ ভারতীয়দের বোধগম্য ছিল না। কিন্তু সংস্কৃত থেকে যখন তা নানা ভারতীয় ভাষায় বিনির্মিত হল বিভিন্ন কবি ও সাহিত্য অনুরাগীর মাধ্যমে রামায়ণ-এর নানান-পাঠকৃতি ভারতীয় জনমানসকে প্রভাবিত করল। ড. রমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মনে করেন: : The landscape of Indian mind is being watered by the numerous rivers and riverines emerging from the Ganga of Valmike Ramayana. The world of Rama has naturally a corresponding structure in the mind of every Indian.

তিনি মনে করেন প্রায় প্রতিটি ভারতীয়দের বিশ্বাস ও উপলব্ধির মধ্যে রামায়ণের সাবস্ট্রাকচার দ্রবীভূত আছে। প্রথম অধ্যায়ের মনস্তত্ত্ব ও সাহিত্য আলোচনা করতে গিয়ে প্লাতো থেকে কান্ট, ফ্রয়েড, ইয়ুং, আই. এ রিচার্ডস রামায়ণের পাঠকৃতির ভেতর তিনি অনেকগুলি স্তর লক্ষ্য করেছেন। তিনি মনে করেন: The mind has (i) desire in the unconscious ego and superego. Taking the cue from Jung and the Upanisads we say that the unconscious is not merely the seat of id; it has in the desire for higher state of selfhoods (ii) the ego helps or hinders it (iii) Fullfillment mean the acknowledgement or refusal of the same by the superego. ফলে বাল্মিকী রামায়ণের স্ট্রাকচার-এর বৃত্তটা এভাবে সাজিয়েছেন:

বৃত্ত-১

আকাঙ্ক্ষা—বাল্মিকী একজন আর্দশ মানুষের খোঁজ করছেন।

সাহায্যে—নারদ ও ব্রহ্মা তাঁকে সাহায্যে করেন।

বা

বাধাপ্রাপ্তি — বাল্মীকি রামায়ণ মহাকাব্যে তাঁর প্রার্থিত আদর্শ মানুষকে উপলব্ধি করলেন।

বা

ব্যর্থতা

বৃত্ত-২

আকাঙ্ক্ষা-দশরথ একটি পুত্র চাইলেন।

সাহায্যে—ঋষ্যশৃঙ্গ তাঁকে সাহায্যে করেন।

বা

বাধা

প্রাপ্তি—রামের জন্ম।

বা

ব্যর্থতা

বৃত্ত-৩

আকাঙ্ক্ষা-কৈশোরে রাম নিজেকে প্রকাশ করতে চাইলেন।

সাহায্য-বিশ্বামিত্র তাঁকে সাহায্যে করেন।

বা

বাধা

প্রাপ্তি—রাম সীতাকে জয় করেন।

বা ব্যর্থতা

বৃত্ত-৪

আখাঙ্ক্ষা—দশরথ চাইলেন রাম অযোধ্যায় থাকুন এবং তাঁর যৌবরাজ্য অভিষেক হোক।

সাহায্য।

বা

বাধা

প্রাপ্তি—কৈকেয়ী বাধা হয়ে দাঁড়ালেন।

বা ব্যর্থতা—রাম যৌবনের অভিষিক্ত হতে পারলেন না; অযোধ্যা থেকে বারো বছরের জন্য তাঁকে নির্বাসিত হতে হল।

বৃত্ত-৫

আকাঙ্ক্ষা-রাম বনবাসে শান্তিতে বারো বছর কাটাতে চাইলেন।

সাহায্য—লক্ষণ ও সীতা তার সঙ্গে গেলেন।

বা

বাধা

প্রাপ্তি-রাবণ সীতাকে হরণ করলেন।

বৃত্ত-৬

আকাঙ্ক্ষা-রাম সীতাকে খুঁজতে শুরু করলেন।

সাহায্য—হনুমান তাঁকে সাহায্যে করল।

বা

বাধা

প্রাপ্তি-রাম সীতাকে ফিরে পেলেন।

বা ব্যর্থতা।

বৃত্ত-৭

আকাঙ্ক্ষা-রাম প্রজা শাসনে মন দিলেন।

সাহায্য

বা

বাধা

প্রাপ্তি

বা ব্যর্থতা—রাম যতদিন শাসন করতে ও বেঁচে থাকতে চেয়েছিলেন তা সম্ভব হল না, রাম মারা গেলেন।

রামায়ণের ২৪০০০ শ্লোক বর্ণনা এ-রকম ভাবেই বৃত্তীয় স্ট্রাকচারে দাঁড়িয়ে আছে। এই স্ট্রাকচারকে বিশ্লেষণ করলে রামায়ণের আর্কিটাইপ-স্ট্রাকচার উঠে আসে।

মিথুনলগ্ন ক্রৌঞ্চি এবং নিষাদের হাতে ক্রৌঞ্চের মৃত্যুর ঘটনা ড.রমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মনে করেন সমগ্র রামায়ণের মূল সুর তৈরি করে দিয়েছে। ঘটনাটি সাজিয়েছেন তিনি এভাবে:

e_1 – a pair of birds are mating.

e_2 – a hunter kills one of them.

e_3 – the other cries in agony.

e_4 – a saint finds it and feels pity for the wailing bird and rages against the hunter.

e_5 – He discovers the slake for himself.

এই ঘটনাটি বাল্মিকী রামায়ণ সৃষ্টির গোপনকথা। এ-ঘটনা থেকেই রামায়ণ মহাকাব্যের তত্ত্বের উৎপত্তি। এ-ঘটনার আকস্মিকতা থেকেই রামায়ণ রচনার সূত্রপাত। বেঁচে থাকা ক্রৌঞ্চির জন্য করুণা, মৃত ক্রৌঞ্চের জন্য দুঃখ; নিষাদের প্রতি বাল্মিকীর প্রতি বাল্মিকী ২৪০০০ শ্লোকে রূপান্তরিত করেছেন। রামায়ণের প্রতিটি অধ্যায়ের স্ট্রাকচারে বিশ্লেষণ করে ড. রমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়-এর মনে হয়েছে:

A narrative progresses with moves in a game of chess. Once the hero is born from the wombs of unconscious, he is acted upon. The images of the reality of the non-being reacts to his very presence. And then the interaction between the hero and the circumstances forged in the work of art itself interact with one another and moves ahead listless of the poet's will.

রামায়ণ যা রূপকথার গল্পের পাঠকৃতি শুরু হয়েছিল তা রূপান্তরিত হল মিথে। আমাদের মানবজীবনের যা কিছু ঘটনা আকস্মিক ঘটে। চেতনার রাজ্য পার হলেই আমরা ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করি আর তখনই অনুভব করি মানুষ সবসময়ই প্রকৃতির দয়ার ওপর বেঁচে আছে। ড.রমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পোস্টমডার্ন আলোচনার নিরিখে রামায়ণের বিশ্লেষণ আমাদের সমৃদ্ধ করে।

মার্কসীয় চোখে বাল্মিকীর রাম

৬ ডিসেম্বর ১৯৯২ বাবরি মসজিদ ভাঙার পর রামভক্ত সঙ্ঘ পরিবারের রাম 'পুরুষোত্তম'--এর মর্যাদা পেতে পারেন কিনা? এ নিয়েই অধ্যাপিকা সুকুমারী ভট্টাচার্য–র বাল্মিকী-রাম--ফিরে দেখা। নির্মোহ দৃষ্টিতে তিনি রামের কাজ কর্মের বিচার বিশ্লেষণ করে বিভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। তাঁর মনে হয়েছে বন গমন পর্ব পর্যন্ত রাম আর্দশ পুরুষ হলেও তারপর থেকে তাঁর চরিত্রের মধ্যে অনেক দোষ খুঁজে পাওয়া যায়। প্রথম জীবনে তাড়কা রাক্ষসীকে বধ করার সময় তিনি দ্বিধাগ্রস্থ ছিলেন নারীকে আঘাত করার প্রশ্নে। বিশ্বামিত্র-র পরামর্শে তিনি সে দ্বিধা কাটিয়ে নারীকে বধ করেন। পরিণত জীবনে রাম শম্বুককে মৃত্যুদন্ড দেন, কারণ সে শূদ্র হওয়া সত্বেও তপস্যা করছিল বলে। অথচ রাম-রাজত্বে সব প্রজাকেই সমান চোখে দেখার কথা। মূল রামায়ণে রাম দেবতা না, মানুষ। কিন্তু রামায়ণের কাহিনিগুলোর সঙ্গে প্রক্ষিপ্ত কাহিনিগুলো যখন যোগ হল তখন দেখা গেল রাম বিষ্ণুর অবতার। মানুষ রামের ওপর দেবত্ব আরোপ করা হল। অধ্যাপিকা সুকুমারী ভট্টচার্য রামায়ণের রামকে মোহহীন বিচারে বিশ্লেষণ করেছেন। মাত্র ২৪ পৃষ্ঠার বই-এ রামায়ণের যে পাঠকৃতির তিনি নির্মাণ করেছেন, বিশেষত রাম, এই আর্কিটাইপ চরিত্রটিকে, তা আমাদের মুগ্ধ করে। মাঝে মাঝে মনে হয় মার্কসীয় দৃষ্টিকোণ থেকে রামায়ণের নতুন ডিসকোর্স গড়ে তুলেছেন। তাঁর এই ছোট বইটি বিশেষ মুগ্ধতা নিয়ে ফিরে ফিরে পড়েছি। অনেক কম কথায় বহুমাত্রিক রামের দোষগুণ নির্মোহ দৃষ্টিতে বিচার করেছেন।

বইটির শুরুতেই তিনি রামায়ণের রচনাকাল, স্তরবিন্যাস ও রচনার প্রক্রিয়া সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। তাঁর মনে হয়েছে: মূল এবং প্রক্ষেপের পার্থক্য নিহিত আছে ভাষা,

ব্যাকরণে, অলংকারে, বিষয়বস্তুতে ও ধর্মীয়—দার্শনিক মূল্যবোধে।'

রাম উপাখ্যান নিয়ে অধ্যাপিকা সুকুমারী ভট্টাচার্য যেসব প্রশ্ন তুলেছেন তা রামের অন্ধভক্তদের আঘাত করলেও প্রশ্নগুলির গুরুত্ব আছে:

১. রাম যেভবে বালীকে বধ করেছেন ক্ষত্রিয় বীরের পক্ষে গর্হিত কাজ। রাম বীর, সুগ্রীবের সাহায্যে পাওয়ার আশায় তিনি বালী বধের মতো অন্যায় করলেন এবং বালীকে আড়াল থেকে বধ করলেন, এর থেকে প্রমাণিত হয় রাম-কে যত বড় বীর আমরা ভাবি, রাম তা ছিলেন না। সম্মুখ সমরে বালীর সঙ্গে তিনি লড়াই চাননি। বালী হত্যাকে মৃগয়া বলা তাঁর কুযুক্তি। বালীবধ রামের কাপুরুষযোচিত কাজ।

২. গুহক চন্ডাল বলে, রাম তাঁর কাছে শুধু পশুর খাবার গ্রহণ করলেন। ফল আহার করলেন না। এ নিয়ে বর্ণ-বৈষম্যের প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক।

৩. রাম শম্বুককে বধ করলেন ব্রাহ্মণের অকাল মৃত পুত্রকে বাঁচাতে। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে রাম রাজত্বে সব প্রজা সমান না। নিম্নবর্গের মানুষের প্রাণের কোন মূল্য নেই। ব্রাহ্মণের প্রাণ শূদ্রের প্রাণের চেয়ে দামি।

৪. সীতাকে রাম যেভাবে, যে ভাষায় বার বার প্রত্যাখান করেছেন তা থেকে মনে হওয়া স্বাভাবিক রাম সীতার উচ্চমার্গের প্রেমের মর্মার্থ বোঝেননি। তাঁর বিলাপ ছিল সীতা সম্ভোগ বঞ্চিতের বিলাপ। সীতার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক মুখ্যত যে সম্ভোগের তা রাম নিজেই স্বীকার করেছেন—যেহেতু রাবণ সীতাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন, অতএব সীতা পরপুরুষ চোখে দূষিত, সীতাকে রাম পরিভোগ করতে পারেন না। তাহলে তাড়কা রামকে বিয়ে করতে চাওয়ায় রামও তো দূষিত—তাঁকে সীতা গ্রহণ করবেন কি করে? এ প্রশ্ন ওঠে।

রামচরিত্রের নানা অসঙ্গতি রামায়ণ রচনার সময়কালকে বিশ্লেষণ করে অধ্যাপিকা সুকুমারী ভট্টচার্য দেখিয়েছেন। তিনি রামায়ণ রচনাকালের ভারতীয় সমাজজীবনে,ঐ সময়ের প্রথা, আদর্শ, নীতিবোধ, দর্শন পর্যালোচনা করে রামের দোষগুণ বিচার বিশ্লেষণ করেছেন। রামায়ণ রচিত হওয়ার সময় ভারতবর্ষের সীমান্ত প্রদেশে বারবার বিদেশি আক্রমণ ঘটেছিল। বিদেশি আক্রমণে অরক্ষিত নারীদের কী দশা হত, সুকুমারী ভট্টচার্য মনে করেন রাবণের সীতা হরণ তার একটি রূপকচিত্র। তাঁর এই ছোট্ট বইটিতে ভারতের প্রাচীন শাস্ত্র, সংহিতা, বর্ণাশ্রমপ্রথা সবেরই কষ্টিপাথরে রামকে ফেলে রামরাজ্য সম্বন্ধে আমাদের মোহভঙ্গ করেছেন। সীতার প্রতি রামের আচরণের দৃশ্যগুলি ছবির মতো তুলে এনে তিনি দেখিয়েছেন: 'সমাজ কখনই নারীকে ব্যক্তি বলে স্বীকার করেনি, ভোগ্যবস্তু, পণ্যদ্রব্য এই সব আখ্যা দিয়েছে।' 'তাঁর মতে বাল্মীকির মূল রামায়ণ কবির লেখা মহাকাব্য—রাবণ বধেই শেষ হয়েছে—যা মহাভারতের, ইলিয়দ, ওদিসি, এন সিড, কালেভ্লা, নীবেলুঙ্গেন লীড্-এর মতো মহাকাব্যে দেখা যায়। পরে শাস্ত্রকাররা রামায়ণের প্রক্ষিপ্ত অংশগুলি রচনা করে মহাকাব্যটিকে ঢেলে সাজিয়ে সমাজে শূদ্র ও নারীর স্বাধীনতাকে খর্ব করে শাস্ত্রীয় বিধানের কাছে মহাকাব্যটির পরাজয় ঘটিয়েছেন। রামরাজ্যে নারী ও নিম্নবর্গের কোন স্থান নেই বলেই রামভক্ত সঙ্ঘ পরিবার বাবরি মসজিদ ভেঙে রামমন্দিরের স্বপ্ন দেখেন!.....

রামায়ণে রাম

রমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

রামায় রামচন্দ্রায় রামভদ্রায় বেধসে।
রঘুনাথায় নাথায় সীতায়াঃ পতয়ে নমঃ।।
আমারাও ছোটবেলায় নির্জনে পথ চলতে চলতে বলেছি,
ভুত আমার পুত
পেত্নী আমার ঝি।
রাম লক্ষ্মণ বুকে আছে
ভয়টা আমার কি?

সেকালে তো বটেই একালেও ছোট মেয়েরা পুণ্যিপুকুর করে কোথাও কোথাও। অন্তত কোন কোন জায়গায় মেয়েরা তখন বলে,

রামের মত পতি পাবো
সীতার মত সতী হবো।

রামায়ণের গল্প যারা জানে তারা হয়তো রামের মতো পতি সচেতন মনে চাইবে না। তার কারণ রাম কতটা সীতাকে ভালোবাসতেন, সে প্রশ্ন সঙ্গত কারণেই করা যায়। রাবণের কাছ থেকে রাম সীতাকে উদ্ধার করলেন। এবার তিনি বললেন—তুমি মুক্ত। তুমি এবার ইচ্ছে করলে লক্ষ্মণ বা শত্রুঘ্নকে বিয়ে করতে পারো। যেখানে খুশি চলে যেতে পারো। (জয় সীতারাম!) খুব বড় রামভক্তও রামের এই কথা মনে মেনে নিতে পারে না। যদি সে তবু ও বলে— Ram can do no wrong তবে বলতেই হয় আপনি ছাব্বিশ বছর ধরে যে স্ত্রীর সঙ্গে বাস করেছেন, তাকে গিয়ে একবার বলুন না—তুমি যেখানে ইচ্ছে চলে যাও। ঝাঁটা হস্তে দেবীর ভুবন ভয়ংকরী রূপ দেখতে পেতে পারেন হয়তো। সীতা অগ্নিপরীক্ষা দিলেন। তারপরেও মিডিয়ার অপপ্রচার শুনে রাম সীতাকে আবার ত্যাগ করলেন। কেন ত্যাগ করলেন?

রাজা তাঁকেই বলা হয় যিনি প্রজাদের মনকে খুশি করতে চান। ব্যাপারটাকে কি আক্ষরিক অর্থেই রাম মেনে নিয়েছিলেন? দেশের রাজা আর দেশের নেতা সমার্থক। প্রজারা যা বলবে, যা চাইবে, নেতা বা রাজা কি তাই দিতে বাধ্য?

রাম রাজা, আমরা জানি তিনি গর্ভবতী স্ত্রীকে প্রজাদের কথায় পরিত্যাগ করেছিলেন। রামের এই কাজ একালে কেন সেকালেও মেনে নিতে পারেননি অনেকেই। তাই ভবভূতির উত্তর রাম চরিতের প্রথম অংকের শেষে, আমরা দেখি, সীতা রামের হাতের ওপর শুয়ে রয়েছেন। দুর্মুখ যখন জানালো লোকে সীতা সম্পর্কে কানাকানি করছে রাম ঠিক করলেন সীতাকে পরিত্যাগ করবেন। সীতা তখনও ঘুমুচ্ছেন। রাম হাতটা সরিয়ে নিলেন। তারপর রামের একটি দীর্ঘ Soliloquy আছে। সেই Soliloquy তে রাম সীতাকে পরিত্যাগ করতে

হবে বলে দীর্ঘ বিলাপ করছেন। আমরা প্রবন্ধ দীর্ঘ হবার ভয়ে Soliloquy টি উদ্ধৃত করছি না। সীতা ঘুমোচ্ছেন। বিলাপের শেষে রাম সীতার পায়ে মাথা দিলেন এবং বললেন-- "রানি! এই শেষবার রামের মস্তক তোমার চরণ কমল স্পর্শ করল।"রাম কাঁদছেন।

(সীতারাঃ পাদৌ শিরসি কৃত্বা) দেবি দেবি

অয়ং পশ্চিমস্তে রামশিরসা পাদপংকজস্পর্শ:

(রোদিতি)

ভবভূতি, সীতা পরিত্যাগের episode টিকে বাদ দিলেন না। কিন্তু, সীতা পরিত্যাগের কাহিনিতে তিনি আহত হয়েছিলেন। যে কোনও কাহিনির নায়ক কাহিনিটির ইগো বা অহং। পাঠক অনেক সময় নায়কের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায় বা কাহিনির অহং এর সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায়। বাল্মীকির রাম কাহিনির পাঠক হিসেবে তিনিও রামের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছেন। তাই রামায়ণের নিজস্ব সমাজের রীতিনীতি অনুসারে রামকে সীতা পরিত্যাগ করতে হবে। তবুও অনুশোচনায় দগ্ধ হয়ে নিজেই রাম হয়ে ভবভূতি সীতার পায়ে ধরলেন।

ভবভূতির রাম বললেন–*এই শেষবারের মত রামের মস্তক তোমার চরণকমল স্পর্শ করল*। তার মানে, ভবভূতির সমাজে স্বামীর ও বউদের পায়ে ধরত।

প্রসঙ্গত, সীতা সম্পর্কে জনসাধারণের এই কানাকানি কিন্তু একেবারে অযৌক্তিক নয়। দেশশুদ্ধ কানাকানি হয় তাকে নিয়ে, যার দেশ জুড়ে importance (I) আছে এবং যার সম্পর্কে অস্পষ্টতা ambiguity (A) আছে।

I × A — Scandal

সীতা রাক্ষসের ঘরে কতদিনই না অবরুদ্ধ ছিলেন। তিনি দেশের ফার্স্ট লেডি। তিনি রাবণের ঘরে আবদ্ধ থেকেও সতী ছিলেন একথা কে হলপ করে বলবে। অযোধ্যায় জনসাধারণ তো সীতার অগ্নিপরীক্ষার চোখে দেখেনি। সুতরাং অগ্নিপরীক্ষার কথা গুজব হতেই পারে।

কিন্তু দুটি প্রশ্ন প্রসঙ্গতঃ উঠে আসে :

(এক) বাল্মিকীতেই বলা হয়েছে প্রজাদের ইচ্ছানুসারে প্রজানাং হিতকাম্যয়া রাজা দশরথ রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করতে চেয়েছিলেন। যদি সত্যিই তাই হয়, প্রজাদের ইচ্ছে যদি থেকে থাকে রাম যুবরাজ হোক, তবে রাম কেন প্রজাদের কথামতো অযোধ্যায় থেকে গেলেন না। পিতৃসত্য তাঁর কাছে বড় হল না কেন?

(দুই) রাজা কি প্রজারা যা বলবে তাইই শুনতে বাধ্য। প্রজাদের কি সৎপথে নিয়ে যাওয়ার কোনও দায়িত্বই নেতার নেই। প্রজাপালন মানে প্রজাদের কথায় ওঠাবসা নয়।

এই রামায়ণ থেকে শিক্ষা নিয়েই হয়তো আজকালের নেতারা তাই জনসাধারণের কথা কানে দেন না। রামকে লোক নিন্দে করে বলেই, এরা রাম যে ভুল করেছে সে ভুল আর করে না। বরং, দেশে যা হচ্ছে হোক--এমন তো কতই হয়; আমার ছেলের যাতে মার্বেলের বাড়ি হয়; এটাই আজকের কোন কোন রাজনীতিবিদের সিদ্ধান্ত।

আজকাল কেউ কেউ বলেন--রামরাজ্য চাই। গান্ধীজি স্বয়ং রামরাজ্যের কথা বলেন। রাম রাজা মানে সেই রাজা যেখানে রাম নিজে থাকবে বা রামের মতো রাজা থাকবে। কিন্তু

সীতা পরিত্যাগ দেখে প্রশ্ন জাগে রাম কেমন রাজা ছিলেন?

বাল্মিকী রামায়ণে এই রামের গল্প কেমন করে উত্থাপিত হল? নারদঠাকুর এসেছেন, খবর পেয়ে বাল্মিকী শিষ্যসমভিব্যাহারে তাঁর কাছে পৌঁছালেন।

বাল্মিকী—আচ্ছা একটা ভালো মানুষের খবর দিতেক পারেন? যে ধর্মজ্ঞ কৃতজ্ঞ। অথচ যুদ্ধে যিনি দেবতাদের কাছেও ভয়ংকর, এমন কোনও লোক।

নারদ—এ প্রশ্ন তো কঠিন। (একটু ভেবে) তবে হ্যাঁ ভালো তো আছে। সে হল অযোধ্যার রাম।

ব্যস, বাল্মিকী ঠাকুর অযোধ্যার রামকে নিয়ে ভাবতে বসলেন। ব্রহ্মার বরে রামের ভেতর বাইরে সব জেনে ফেললেন। রাম তাঁর স্বপ্নের আর্দশ পুরুষ। রামের জীবনচরিত লিখতে লিখতে তিনি নিজেই কাহিনিতে অংশগ্রহণ করতে বাধ্য হলেন। সীতাকে লক্ষ্মণ যখন বনে রেখে দিয়ে গেল, তিনি সীতাকে আশ্রয় দিলেন। তিনি কোনও কথা বললেন না ঠিকই, কিন্তু সীতা বাল্মিকীর কাছে আশ্রয় পেলেন মানেই বাল্মিকী রামের সব কাজে সমর্থন করেননি।

এহ বাহ্য। জনসমক্ষে সীতাকে দ্বিতীয়বার পরীক্ষা দিতে বলা হল। লক্ষ লক্ষ জনতা অপেক্ষা করছে। রোমান কলোসিয়ামে যেমন লোকে অপেক্ষা করত, ক্রীতদাসদের সঙ্গে বাঘ--সিংহের লড়াই দেখতে!

সেই জনসমক্ষে ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে কৌপীন পরিহিত নিষ্কিঞ্চন ঋষি বাল্মিকীকে অনুসরণ করে গৈরিকবসনা সীতা হেঁটে ঢুকছেন—শ্রুতিকে যেমন স্মৃতি অনুসরণ করেন।

বাল্মিকী, রামের কাছে এলেন।

বাল্মিকী—রাম! আমি তোমায় সত্য করে বলেছি, এই সীতা নিষ্পাপ। আমার এই কথা যদি মিথ্যা হয় তবে আমার সমস্ত তপস্যা বিফল হোক।

একজন ঋষির তপস্যাই তো একমাত্র কাজ। দীর্ঘ জীবন ধরে যিনি তপস্যা করেছেন, তিনি সেই তপস্যার ফল বাজি ধরছেন।

অর্থাৎ গল্পকার স্বয়ং গল্পে নাক গলালেন। যে স্বপ্ন দেখছে, সে নিজেই স্বপ্নের বিরোধিতা করছে। গল্প আর স্বপ্নের একটা মিল আছে। গল্প তো আমাদের মনের কথারই externalisation। স্বপ্নও আমাদের মনের কথা। কেবল স্বপ্নের কোনও মাধ্যম নেই। গল্পের মাধ্যম আছে। সেটা হল ভাষা। তো যাই হোক বাল্মিকী তাঁর আদর্শ মানুষের স্বপ্নের মানুষের গল্প লিখতে লিখতে সেই মানুষের কাজকর্মের প্রকারান্তরে প্রতিবাদ করলেন।

ভাসের কর্ণভারম্ নাটকে, ব্রাহ্মবেশী ইন্দ্র কর্ণের কাছে কবচকুন্ডল চেয়েছিলেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ চলছে। কবচকুন্ডল কর্ণের দেহরক্ষা। কবচ কুণ্ডল থাকলে বীরশ্রেষ্ঠ অর্জুনও তাঁকে মেরে ফেলতে পারত না। কিন্তু তবু ব্রাহ্মণ, যাকে কর্ণ মুহূর্ত দ্বিধা না করে কবচকুন্ডল দিয়ে দিলেন। সঙ্গে শল্যরাজ ছিলেন। শল্যরাজ কর্ণের সারথি। তিনি কর্ণকে বললেন যে কর্ণ কৃষ্ণের দ্বারা প্রতারিত হচ্ছেন। কিন্তু কর্ণের কাছে ব্রাহ্মণবেশই যথেষ্ট। ব্রাহ্মণবেশী কোনও প্রার্থীকে তিনি ফেরান না।

আর ঋষি বাল্মিকীকে রাম প্রত্যাখ্যান করলেন। সীতাকে আবার তাঁর সতীত্বের পরীক্ষা

দিতেই হবে!

আবার সীতার সতীত্ব নিয়েও প্রশ্ন ওঠে। সীতা মানে যদি এমন কোনও নারী হয় যে স্বামীর অনুগত, তাহলে সীতা আরেকবার আগুনে ঝাঁপ দিতেই পারতেন। অগ্নিদেব আরেকবার সীতাকে কোলে করে সকলের সামনে রাখতেন, বলতেন—রাম,এই সীতা নিষ্পাপ।

সীতা তা করলেন না। *পৃথিবী দ্বিধা হও*। তিনি ধরিত্রীর কোলে অধিষ্ঠিত হয়ে সকলের সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

কিন্তু তবুও আজও মেয়েরা বলে—

রামের মত পতি পাবো
সীতার মত সতী হবো।

সতী হওয়া মানে আগুনে ঝাঁপ দিয়ে পুড়ে মরাও হতে পারে! দক্ষকন্যা পতিনিন্দা কানে শুনবেন না বলে সতী হলেন। আর সীতা স্বামীর প্রতি অভিমানে সতী হলেন। সেকালের মেয়েরা কি জানত বিয়ে করা মানে সংসারের আগুনে জ্বলে পুড়ে মরা?

শুধুমাত্র তাই নয়। এই লেখকের পরিচিত এক অন্য ধর্মাবলম্বী মেয়ের বিয়ে হয়েছিল তাজবেঙ্গলে। পাত্রও অন্য ধর্মের। বিয়ে শেষ হলে পাত্র পাত্রীকে প্রশ্ন করেছিলেন—তুমি কি সীতার মতো আমাকে ভালোবাসবে?

উত্তর ভারতের গ্রামে গঞ্জে ঘুরে দেখেছি। সেখানে অনেকে পড়াশোনা জানে না, কিন্তু কথায় কথায় তুলসীদাস থেকে উদ্ধৃতি দেন।

রামানন্দ সাগরের রামায়ণ যখন টিভিতে হত, রাস্তাঘাট শুনশান। সবাই টিভির সামনে বসে আছে।

রামায়ণ কাহিনি আর মহাভারতের গল্প। সেই কবে প্রথম বলা হয়েছিল। তারপরে সেই গল্প নিয়ে কত লক্ষ লক্ষ গল্প তৈরি হয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। এখনও সেই গল্প টিভিতে দেখালে সবাই রুদ্ধশ্বাসে শোনে। এ যেন ভারতীয় সমাজের শিরায় আবহমান প্রবহমান শোণিত। কিন্তু কেন? সে উত্তর এই মুহূর্তে বর্তমান লেখকের জানা নেই।

তবে একটি কথা হলফ করে বলা যায়। ভারতীয় সমাজের সমষ্টি মনটিকে ধরতে হলে যে কোনও মানুষকে এই রামায়ণ, মহাভারতের দ্বারস্থ হতে হবে। এখানেই ভারতীয় চেতনার আর্কেটাইপ 'archetype' রয়েছে। ফ্রয়েড বলেন, কোনও ব্যক্তিই একটি গোটা ব্যাপার নয়। কারণ তার তিনটে মন—চেতন, অবচেতন, অচেতন। একটা লোকের তিনটে মন থাকায় কোন মনটা সে কী বলতে পারে। তবে প্রত্যেকে নিজের চেতনা সম্পর্কে যতটা ওয়াকিবহাল, অপরের চেতনা সম্পর্কে সে মোটেই ওয়াকিবহাল নয়। আমি যেমনভাবে জানি আমি বেঁচে আছি, তেমনভাবে কি বুঝি যে আপনি বেঁচে আছেন? তবে আপনারও হাসিকান্না আছে, আপনারও আমার মতো খিদে পায় ঘুম পায়। তাই অনুমান করে নিই আপনিও আমার মতো বেঁচে আছেন। সেইজন্যেই যে কোন ও মানুষ অন্য কোনও মানুষকে (যতই বড় বড় কথা আওড়ানো হোক না কেন) বস্তু হিসেবেই ব্যবহার করে, পুরুষ নারীকে বস্তু হিসেবে ব্যবহার করে, নারীও পুরুষকে বস্তু হিসেবে ব্যবহার করে। কিন্তু দার্শনিক ইয়ুং বলেন, এহো বাহ্য। ঐ তিনটে মনের আড়ালে আরেকটা মন আছে। যেখানে আমি তুমি যে,

আমার তোমার তার মন এক এবং অখণ্ড; সেই মন সমষ্টি মন। এই সমষ্টি মনের গুহায় অভিজ্ঞতার মণিমুক্তোকেই ইয়ুং আর্কেটাইপ বলেছেন।

রামায়ণ, মহাভারত আর্কেটাইপ। এই রামায়ণ বলতে অবশ্যই বাল্মিকী রামায়ণ, আবার যে কোনও রামায়ণ হতে পারে। সেটা কৃত্তিবাস, তুলসীদাস, কালিদাস, ভাস, ভবভূতি, কম্ব, আর.কে.নারায়ণের রামায়ণ হতে পারে। এমনকি থাইল্যান্ডের রামকিয়েনও হতে পারে। রামকাহিনি নির্দেশ্যে হয়েও অনির্দেশ্য। আর্কেটাইপ একটা পাথরের মতো সীমিত নয়, যে বলব, এই আর্কেটাইপের ওজন, এই আর্কেটাইপের আকার।

মজা হল খৃষ্টানদের কাছে যেমন বাইবেল, ভারতীয়দের রামায়ণ সেইরকমই।

অথচ বাইবেলের ব্যাখার একটু উনিশ থেকে বিশ হোলে খৃস্টানদের ভুরু কুঁচকে যায়। মধ্যযুগে তারজন্যে কত মানুষকে পুড়িয়ে মারা হয়েছে। রেনেসাঁ যুগে তাদের বিরুদ্ধে ফতোয়া জারি করা হয়েছে। কিন্তু ভারতবর্ষে একালে কেন সেকালেই, কত নতুন নতুন রামকাহিনি বলা হয়েছে। তার কত নতুন নতুন ব্যাখ্যা হয়েছে। ভবভূতি রামকে দিয়ে সীতার পা ধরিয়েছেন। কিন্তু তারজন্যে ভবভূতির বিরুদ্ধে কেউ ফতোয়া জারি করেনি। উল্টে বলেছে--ভবভূতি মহাকবি। অথচ আদিকবি বাল্মিকীর কোনও অবমূল্যায়ন হয়নি।

আমাদের জানা ইতিহাসে এ এক চমৎকার ঘটনা।

গ্রন্থপঞ্জী

১. বাল্মিকী রামায়ণ -- সারানুবাদ রাজশেখর বসু, এম. সি. সরকার এন্ড সন্স
২. কৃত্তিবাসী রামায়ণ – শ্রী বেণীমাধব শীল সম্পাদিত
৩. শ্রী রামচরিতমানস – বসুমতী সাহিত্য মন্দির
৪. Kumbo Ramayana Tr. by P. S. Sundaram, Edited by Jagannathan, Penguin Books
৫. Sri Ramcharitmanasa - Gita Press, Gorakhpur, India
৬. A Critical Inventory of Ramayana Studies in the World. Vol.I, Vol. II
Edited by K. Krishnamoorthy, Sahitya Akademi
৭. Painted Words - G. N. Devy, Penguin
৮. Valmiki Ramayana Reconsidered, Dr. Rameshchandra Mukhopadhyay, Anamika
৯. রামায়ণের আদিকান্ড – বাল্মিকী, কৃত্তিবাস, তুলসীদাস এবং কম্বো রামায়ণের বালকান্ডের তুলনামূলক আলোচনা, ড. রমেশ মুখোপাধ্যায় ও নন্দিতা ভট্টাচার্য, রাইটার্স ফোরাম
১০. রামায়ণ কথা, স্বামী তথাগতানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়
১১. The Ramayana, R.K. Narayan, Vision Books, New Delhi, Mumbai, Hyderabad
১২. Rama-Katha In Tribal and Folk Tradition of India -- Edited by K. S. Singh and Birendranath Datta.
১৩. 'বাল্মিকীর রাম, ফিরে দেখা', সুকুমারী ভট্টাচার্য, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রা. লি.
১৪. ভেরিয়ার এলুইন, সংকলন ও সম্পাদনা মহাশ্বেতাদেবী, সাহিত্য অকাদেমি
১৫. রামকথার প্রাক্ ইতিহাস, সুকুমার সেন, জিজ্ঞাসা
১৬. অমৃতলোক ১০৬, রামায়ণ ক্রোড়পত্র, সম্পাদনা সমীরণ মজুমদার।